পান্নার প্রতিশোধ

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য দেড় টাকা।

ভাদ্র—১৩২৬
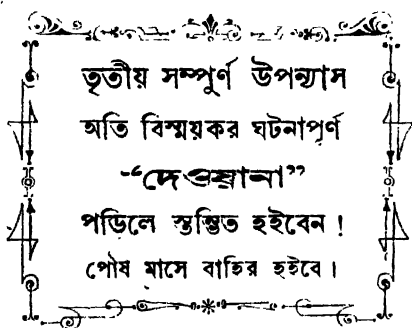
প্রিণ্টার—শ্রীশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়,
বাণী প্রেস
১২।১ নং চোরবাগান লেন, সিমলা, কলিকাতা।

পান্নার প্রতিশোধ

প্রথম পরিচ্ছেদ

লাহোরের মোগল-রাজপ্রাসাদের 'খাস্-দেওয়ানের মধ্যে একটী গুপ্ত মন্ত্রণাসভা বসিয়াছে। সভাটী ক্ষুদ্র হইলেও তাহাতে আলোচ্য ব্যাপারটী অতি ভয়ানক। অতি গুরুতর।

রজনীর প্রথম প্রহর বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এখন দ্বিতীয় প্রহরের আমল। যে ব্যাপার সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছিল—তাহার কোন একটা স্থিরসিদ্ধান্ত তখনও পর্য্যন্ত হইতেছিল না।

স্বর্ণরজতাধারে শতসহস্র দীপ সেই মর্ম্মরখচিত কক্ষমধ্যে জ্বলিতেছে। স্ফটিক-দীপের উজ্জ্বলরশ্মি—মিনার কাজ করা ভিত্তি গাত্রে পড়িয়া, বড়ই সুন্দর দেখাইতেছে। রাশীকৃত পুষ্পস্তবক, স্বর্ণ ও রজতখচিত হস্তীদন্ত নির্ম্মিত আধারে, ইতঃস্ততঃ সুশৃঙ্খলভাবে সজ্জিত। উন্মুক্ত বাতায়ন পথ দিয়া রাভি নদীর শীতল বায়ুপ্রবাহ আসিয়া, সেই কক্ষমধ্যে সমবেত, চিন্তাকাতর বীরপুরুষগণের বিশাল ললাটের স্বেদবিন্দু বহুবার মুছাইয়া দিয়া গেল। তবুও তাঁহাদের আলোচ্য বিষয়ের একটা স্থির মীমাংসা হইল না। আর কোন একটা গুরুতর ব্যাপারে

সহজ ও সুখকর মীমাংসা করিতে না পারিলে, বহুক্ষণব্যাপী চিন্তার ফলে, মুখে যে একটা বিরক্তির ভাব ও চাঞ্চল্য প্রকটিত হয়, সেই সভাস্থলে উপস্থিত সকলের মুখেই সেইরূপ একটা চঞ্চল ও বিরক্তির ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল।

সেই কক্ষ মধ্যে এক মণি-খচিত আসনে বসিয়া আছেন—ভারতের ভাগ্যবিধাতা—সম্রাট আকবর শাহ। সেই গুপ্ত মন্ত্রণা কক্ষে আরও চারিজন বীরসেনানী উপস্থিত ছিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন তার্দ্দিবেগ। অপর তিনজনের মধ্যে একজন সম্রাটের পুত্র শাহজাদা দানিয়াল। অপর দুই ব্যক্তি, দিল্লীশ্বরের অনুগ্রহভাজন দুইজন উচ্চপদস্থ সেনাপতি।

বহুক্ষণ পরে আকবরশাহ মৌনভঙ্গ করিয়া বলিলেন,—"তাহা হইলে আমার সেনাপতিদের মধ্যে অতিরিক্ত সাহসী ও কৌশলী বীর এমন কেহ কি নাই, যে মাত্র দুইশত বলিষ্ঠ মোগল সেনা সহায়ে, এই দুর্দ্ধর্ষ আফ্‌জাই-সর্দ্দার মীরানশাকে বন্দী করিয়া আনিতে পারে? আর তাহার রাজধানী ধ্বংশ করিয়া দিতে পারে?"

তার্দ্দিবেগ একজন দুদ্ধর্ষ সেনাপতি। সে একটা কুর্ণীস করিয়া বলিল,—"জাঁহাপনা! এ কার্য্যে আমি অগ্রসর হইতে খুবই প্রস্তুত। কিন্তু দুই শত সেনা সহায়তায় এ দুরুহকার্য্য সম্পন্ন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কেননা পূর্ব্ববারের শোচনীয় অভিজ্ঞতা আমায় বড়ই সতর্ক করিয়া দিয়াছে।"

সম্রাট গম্ভীরমুখে বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিলেন,—"গতবারে

তোমারই বুদ্ধির দোষে, সেই অভিযানের পাঁচ শত বাছা বাছা মোগল-সেনাকে, এই পাহাড়ীরা পাথরের চাপে মারিয়া ফেলিয়াছে। চারিদিকে যুদ্ধবিগ্রহ। এ সঙ্কট সময়ে আমি অনর্থক সেনাক্ষয় করিতে চাহি না। তোমরা এ কার্য্যে তোমাদের অক্ষমতা স্বীকার করিলেই আমিও বুঝিয়া লইব, যে মোগল-রাজ্য দুঃসাহসিক বীর শূন্য হইয়াছে। তোমরা অগ্রসর না হও, আমি না হয় নিজেই এই আফ্‌জাই অভিযানের ভার লইব। কিন্তু তার্দ্দিবেগ! এ কথাটা যেন তোমার মনে থাকে, তুমি বিজাপুর ধ্বংশ করিয়া যে সুনাম সঞ্চয় করিয়াছ, তাহা তোমার বর্ত্তমান অক্ষমতার প্রচণ্ড স্রোতে, অতি দূরে ভাসিয়া যাইবে।"

তার্দ্দিবেগ, নিরুত্তরে রহিলেন। তাঁহারই পরামর্শ মতে আগেকার অভিযানের সেনাদল পরিচালিত হইয়াছিল। সুতরাং ধরিতে গেলে, অতীত পরাজয়ের কলঙ্কটা তাঁহারই চিরযশগৌরব-দীপ্ত মুখের, সমুজ্জ্বল দর্পিতভাবকে কলঙ্কিত করিয়াছিল। তার্দ্দিবেগ চিরদিনই অসমসাহসিক ও সমরে দুর্নিবার। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? দুই শত মাত্র মোগল-সেনা লইয়া বিপদসঙ্কুল পাঠানের পার্ব্বত্যদেশে, সংকীর্ণ উপত্যকার মধ্যে যুদ্ধ করিতে তিনি প্রস্তুত নহেন। এ দিকে বাদশাহও দৃঢ়নির্ব্বন্ধ, যে মাত্র দুইশত সেনা লইয়া এই বিদ্রোহ দমন করিতে হইবে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে মৌনই শ্রেয়ঃ এই ভাবিয়া, তিনি নির্ব্বাক অবস্থায় বসিয়া রহিলেন।

আকবর শাহের নির্ব্বন্ধ বড়ই ভয়ানক। একবার মুখ দিয়া

তিনি যে আদেশ প্রচার করেন, তাহার ব্যতিক্রম করান এ দুনিয়ায় কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

তৃতীয় রাজকুমার দানিয়েল, আকবর শাহের বড়ই প্রিয়। তিনি পিতার পার্শ্বে বসিয়া, এ পর্য্যন্ত যাঁহা কিছু পরামর্শ হইতে-ছিল, সবই শুনিতেছিলেন। কিন্তু কোন বিষয়ে স্বাভিমত ব্যক্ত করেন নাই।

সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া, একটী ক্ষুদ্র কুর্ণীস করিয়া, শাহজাদা বলিলেন,—"যদি শাহ-ইন্-শাহের মনে এমন একটা ধারণা জন্মে, যে এই লাহোর-প্রাসাদে আমরা যে কয়জন সেনাপতি উপস্থিত আছি তাহাদের কাহারও কার্য্যকুশলতা নাই, তাহারা সমরশক্তি ও কৌশলহীন, তাহার প্রতিবাদ করিতে আমি প্রস্তুত। এজন্য এ বান্দার গোস্তাখি মাফ্ হউক। জাঁহাপনার এন্‌সাফ্ আদেশ পাইলে, আমিই দুইশত সেনা সহায়তায় এ কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারি।"

আকবার শাহ, বিস্মিতনেত্রে বারেকমাত্র তাঁহার প্রিয়তম পুত্রের মুখের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, সে সুন্দর মুখে যেন একটা নির্ব্বন্ধ ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছায়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তার্দ্দিবেগও চমকিত চিত্তে একবার শাহজাদা দানিয়ালের মুখের দিকে বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া, মস্তক অবনত করিলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ওষ্ঠাধরের প্রান্ত দিয়া, একটী অতি সূক্ষ্ম অব্যক্ত হাসির রেখা, নীরবে ফুটিয়া নীরবেই বিলীন হইল। তিনি মনে মনে বলিলেন,—"কি দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল এই শাহজাদা দানিয়ালের!

যে কাজ আমার মত অভিজ্ঞ রণকৌশলী ও দুদ্ধর্ষ সেনাপতিতে করিতে অশক্ত হইয়াছে, এই ভবিষ্যৎ জ্ঞানবিহীন রাজকুমার তাহা কি না অতি সহজ কাজ ভাবিয়া, সাক্ষাৎ ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইতেছেন। এটা কি আকবরশাহের পুত্র বলিয়া একটা দম্ভের অভিনয়, না রাজকুমারের মনের প্রকৃত ইচ্ছা এইরূপ।"

তার্দ্দিবেগের মনের কথা, মনেই বিলীন হইল। কার সাধ্য কুমার দানিয়ালের দক্ষতার বিরুদ্ধে বাদশাহের সম্মুখে কোন কথা বলিতে সাহসী হয়? কেননা এই রাজকুমার দাক্ষিণাত্যের অনেক যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া, যথেষ্ট সুনাম লাভ করিয়াছেন।

শাহজাদা দানিয়েলের এই কথায়, সেই জটিল ব্যাপারটার তখনই একটা সহজ মীমাংসা হইয়া গেল। আকবরশাহ পুত্রের সাহস ও শক্তির কথা খুব ভাল রূপই জানিতেন। সত্য বটে, দানিয়েল একটু বিলাসী। সত্য বটে—তিনি দিল্লীর বাদশাহের পুত্রের পদগৌরবের ও ঐশ্বর্য্যের উপযুক্ত মর্য্যাদা রাখিয়া চলিতে চিরদিন অভ্যস্ত—কিন্তু তাঁহার পিতার যেটি প্রধান গুণ, অর্থাৎ দৃঢ় নির্ব্বন্ধ—তাহা তাঁহাতে খুবই ছিল। আকবরশাহ বহু সঙ্গীন যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ঘুরিয়াছিলেন, অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার পুত্রের বীরোচিত সাহস ও শক্তির পরিচয় পাইয়াছিলেন।

আকবরশাহ মনে মনে বুঝিতেন, নিভৃত উপত্যকার পাষাণ প্রাচীরের মধ্যে, এই আফ্জাই পাঠানগণ অতি দুদ্ধর্ষ হইলেও

সমতল ক্ষেত্রের রণাঙ্গণে সমর কৌশল প্রদর্শনে, তাঁহারা মোগল-সেনার তুলনায় কিছুই নহে। পাহাড়ের সমুচ্চশীর্ষে, পাষাণময়ী প্রকৃতির বক্ষান্তরালে, তাহাদের দুর্গ ও রাজধানী সুরক্ষিত। দশ সহস্র মোগলসেনা পাঠাইলেও, সম্মুখ যুদ্ধে তাহাদের কেহ আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না। গত বারের অভিযানে পাহাড়ের উপর হইতে অসংখ্য প্রস্তর রাশি নিক্ষেপ করিয়া, তাহারা একটী পূরা পল্টন মোগলসেনাকে ধ্বংস করিয়া ছিল। শক্তিমান সম্রাট চান, যে কৌশলে এই আফ্‌জাই সর্দারকে আয়ত্ত করিতে হইবে। তাহার দেশ অধিকার ও রাজধানী ধ্বংশ করিতে হইবে। এক্ষেত্রে এইরূপ একজন কৌশলী ও শক্তিমান লোকের প্রয়োজন।

তার্দ্দিবেগ অসমসাহসী সেনাপতি হইলেও, অতি মাত্রায় মদ-গর্ব্বিত ও নিজের ক্ষমতার উপর খুবই আস্থাবান। এজন্য প্রথম বারে তাঁহার বুদ্ধির দোষে, অনেক মোগলসেনা সেই পার্ব্বত্য পথে, বলির মেষের মত প্রাণ হারাইয়াছিল। তিনি মনে ভাবিয়া ছিলেন, সম্রাট এজন্য তাঁহাকে নিশ্চয়ই কোনরূপ কঠোরদণ্ডে দণ্ডিত করিবেন। কিন্তু তিনি যখন দেখিলেন, মাত্র একটা বিরক্তি ও শ্লেষপূর্ণ তিরস্কারের উপর দিয়া সেই মহা ঝড় কাটিয়া গেল, তখন সম্রাট কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইলেও তিনি এবারে এই অভিযানের ভারগ্রহণে সাহসী হইলেন না। এদানীং নানা কারণে আকবরশাহ যে তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন, তাহাও তিনি জানিতেন।

এরূপ একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজে তার্দ্দিবেগকে দ্বিতীয় বার প্রেরণ করিয়া, তাহাকে দরবার হইতে দূরে রাখা ও পুনরায় পরাজয় স্থলে, তাহাকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করাই বাদশাহের মনের প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য ছিল। বাদশাহ যদি একটা নির্ব্বন্ধ ধরিয়া বলিতেন—তার্দ্দিবেগ্! তোমাকে যাইতেই হইবে, তাহাহইলে বেগ্সাহেব মহাবিপদে পড়িতেন। এজন্য এই সব ব্যাপারে, তার্দ্দিবেগ বড়ই দমিয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু মধ্য হইতে রাজকুমার দানিয়েল এই প্রস্তাব করায়, তিনি মনে মনে তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তাকে ধন্যবাদ দিলেন।

সম্রাট কিয়ৎক্ষণ গম্ভীর মুখে থাকিয়া, পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"দানিয়েল! কি ভয়ানক দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার তুমি এখন গ্রহণ করিলে, তাহা একবার বুঝিয়া দেখিয়াছ কি?"

দানিয়েল একটি কুর্নিস করিয়া দর্পিত ভাবে উত্তর করিলেন, "ভারত বিজয়ী আকবরশাহের ঔরসজাত পুত্র হইয়া, যদি এই সংকটময় দায়িত্বের গুরুত্ব না বুঝিতে পারিব, তাহাহইলে আমার রাজকুলে জন্মানই বৃথা হইয়াছে। দক্ষিণাত্যের যুদ্ধক্ষেত্রে এ বান্দার অসিচালনার সকল কৌশলই জাঁহাপনা ত লক্ষ্য করিয়াছেন? তবে কেন এত সন্দেহ? এতটা অবিশ্বাস?"

আকবরসাহ অভিমানী পুত্রের এই উত্তরে প্রীত হইয়া বলিলেন, "ভাল আমি তোমাকেই এই দায়িত্ব পূর্ণ অভিযানের ভার প্রদান করিলাম। আফ্জাই সর্দ্দার মীরাণ-শা, আমার পত্রের বড়ই দর্পময় উত্তর দিয়াছে। তাহার এ দর্পচূর্ণ করিতে

পারিলে, কিম্বা তাহাকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় লাহোর প্রাসাদে আনিতে পারিলে, নববিজিত প্রদেশ তোমারই অর্জ্জিত জাইগীর হইবে। কিন্তু যদি পরাজিত হও—"

বাদশাহ কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু রাজকুমার দানিয়াল তাঁহার পিতাকে তাঁহার কথাগুলি শেষ করিতে না দিয়া বলিলেন,—"তাহা হইলে সম্রাট এই বান্দাকে, তাহার কলঙ্কিত পরাজয়ের দণ্ড স্বরূপ যে শাস্তি দিবেন, তাহাই সে অবনত মস্তকে গ্রহণ করিবে। তখন আর আমি এ কথা মনে ভাবিব না, যে আমি দিল্লীশ্বরের আদরের পুত্র সুলতান দানিয়েল। ভাবিব—একজন সমরে পরাজিত, কলঙ্ককালিমামণ্ডিত, দণ্ডার্হ সেনাপতি।"

দানিয়ালের এই তেজগর্ভ বাক্যে, তার্দ্দিবেগ প্রভৃতি দর্পিত সেনাপতিগণের মুখমণ্ডল আরক্ত ভাব ধারণ করিল। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না, শাহাজাদা দানিয়েলের এরূপ দর্পের ও এ প্রকার আত্মম্ভরিতার গূঢ় কারণ কি?

যাহা হউক; তখনই মন্ত্রণাসভা ভঙ্গ হইল। সম্রাট ও দানিয়েল অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তার্দ্দিবেগ প্রভৃতি সেনাপতিরা প্রকারান্তরে অপমানিত হইয়া, মলিনমুখে সেই স্থান ত্যাগ করিলেন।

বলা বাহুল্য, তৎপর দিন প্রত্যূষে দুই শত দুৰ্দ্ধর্ষ বাছা বাছা মোগলসেনা সঙ্গে লইয়া, রাজকুমার দানিয়েল লাহোর দুর্গ মধ্য-বর্ত্তী মোগল-রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

বিদায় সময়ে আকবরশাহ তাহাকে বলিয়া দিলেন,—"খুব সাবধানে কাজ করিও। দেখিও যেন তোমার বীরোচিত দম্ভ কেবল মাত্র না মুখের কথায় শেষ হয়। সঙ্কটময় পার্ব্বত্য পথে, বলের অপেক্ষা কৌশলকে শ্রেয়ঃ উপায় বলিয়া ভাবিও। আমি চিতোর জয় করিয়াছিলাম অনেক কষ্টে আর প্রচুর কৌশলে। আমার বিশ্বাস, ঠিক অসিবলে নয়। রাজপুত যেমন সহজে পরাজয় স্বীকার করিতে চাহে না, এই আফ্‌জাই পাঠানগণও সেইরূপ। প্রচুর অর্থ তোমার সঙ্গে রহিল। অন্যান্য সর্দ্দারদের মধ্যে ভেদনীতি প্রসারিত করিয়া কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা করিবে। কার্য্যোদ্ধারের জন্য, অর্থব্যয়ে কোন সংকোচই করিবে না। কোন জরুর কারণে যদি আরও সেনাবলের আবশ্যক হয়, সওয়ার ডাকে আমায় সংবাদ পাঠাইবে। এই লাহোর দুর্গে পাঁচ হাজার মোগল সেনা মজুত রহিল। কেবল একটী কথা মনে রাখিও, পাঠান বড়ই বিশ্বাসঘাতক, বড়ই সুচতুর—খুবই মোগলদ্বেষী। যাও বৎস! বিজয়লক্ষ্মী তোমাকে আলিঙ্গন করুন।"

কুমার দানিয়েল পিতৃপদ বন্দনা করিয়া, সসৈন্যে লাহোর রাজপ্রাসাদ হইতে অতি প্রত্যুষে আফ্‌জাই প্রদেশে যাত্রা করিলেন। নিদ্রিত নগরবাসীরা জানিল না, যে একটা ক্ষুদ্র অভিযান সেই উষার অস্ফুট আলোকের মধ্য দিয়া, লাহোর হইতে বাহির হইয়া গেল।

এই ঘটনার সপ্তাহ পরে শাহজাদা দানিয়েল নিরাপদে

আফ্‌জাই রাজধানী হইতে তিন ক্রোশ দূরে গিয়া ছাউনী স্থাপন করিলেন। পূর্ব্ব অভিযানের কয়েকজন অভিজ্ঞ সেনাপতি তাঁহার সঙ্গে ছিল। তাহারাই এই নিরাপদ স্থানে শিবির স্থাপনে পরামর্শ দিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শাহজাদা দানিয়েল, সসৈন্যে যেখানে ছাউনী করিলেন, সেই স্থানের নাম নিমক্‌শা। এখনও এ উপত্যকা বর্ত্তমান।

নিসর্গ সুন্দরীর কৃপায় এ স্থানটী বড়ই মনোরম। চতুঃপার্শ্বের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। উপত্যকা ভূমি খুব প্রশস্ত। কতকগুলি স্নিগ্ধ সলিল ধারাপূর্ণ ঝরণা ও দুইটী গিরিনদী সেখানে তৃষিতের জন্য সলিল সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। সৈন্যগণের জলাভাবের কোন সম্ভাবনাই সেখানে নাই। গভীর বনান্তরালে, ঘনপল্লবময় বিটপীশাখায় লুকাইয়া, শ্যামা, দধিয়াল, পাপিয়া, কলতানে দিগন্ত মুখরিত করিতেছে। গিরিনদীর মৃদুতানময় নীরব সঙ্গীতে সেই স্থান ঝঙ্কৃত। দূরে অদূরে, বামে দক্ষিণে, বিশাল বনভূমি। নিরাপদে আত্মগোপনের পক্ষে অতি সুন্দর স্থান এই উপত্যকা।

মীরাণশার রাজধানী মিরানগড়, নিমক্‌শা হইতে তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী এক পাহাড়ের সমুচ্চ চূড়ায়। নীচের দিক হইতে সে পাহাড়ে সেনা লইয়া উঠিবার কোন সহজ পথই নাই। গায়ের জোরে চেষ্টা করিয়া পথসৃষ্টি করিতে গিয়াই, দাম্ভিক তার্দ্দিবেগ

পূর্ব্ববারে মোগল-সেনাকে বিপন্ন করিয়াছিল। অতীতের ব্যাপার তাঁহার অপরিচিত নহে, এজন্য শাহাজাদা দানিয়েল, সেরূপ সংকল্প ত্যাগ করিয়া, এই নিভৃত স্থানে তাঁবু গাড়িয়া, রাজধানী আক্রমণের উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে সাত দিন কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে তিনি দুই একজন পার্ব্বতীয় সর্দ্দারকে অর্থ দানে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে নিষ্ফল হইয়াছেন। তাঁহার নিযুক্ত গুপ্তচরগণ চারিদিকে ঘুরিতেছে। কিন্তু তাহারা পাহাড়ের সমুচ্চ শীর্ষে অবস্থিত, রাজধানীতে প্রবেশ করিবার কোন গোপনীয় কিম্বা সহজগম্য পথেরই সন্ধান পাইতেছে না।

একদিন গভীর রাত্রে শাহজাদা দানিয়েল নিজের শিবির কক্ষে বসিয়া আছেন। রাত্রি সবে মাত্র এক প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু চারিদিক পাহাড়েঘেরা ও জনসমাগমশূন্য নির্জ্জন স্থান বলিয়া যেন বোধ হইতেছিল, রজনীর দ্বিযাম অতীত হইয়া গিয়াছে।

দানিয়েল বড়ই সেরাজি ভক্ত ছিলেন। বিশেষতঃ কোন কঠিন কাজের জন্য মতলব আঁটিবার সময়, তাঁহার স্বাভাবিক কুটবুদ্ধিকে একটু বেশী মাত্রায় প্রখর করিবার জন্য, তিনি অতিরিক্ত মাত্রায় সেরাজীর সহায়তা লইতেন। বলা বাহুল্য, এই সমরক্ষেত্রেও মোগল রাজপরিবারের সনাতন প্রথানুসারে, তাঁহার দাসী বাঁদিও সাকির অভাব ছিল না।

দানিয়েল মনে মনে ভাবিতেছিলেন,—"বৃথা কালক্ষয়ে

ফল কি? এবার আর অধীনস্থ গোয়েন্দাগণকে গুহ্য-পথের সন্ধানে না পাঠাইয়া, আমি নিজেই ছদ্মবেশে পাহাড়ের জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিব। জীবন যায়—সম্রাটের কাজেই যাইবে। বাঁচিয়া ফিরিয়া আসি, পথের সন্ধান করিতে পারি, মীরাণশাকে ধরিতে আমার বড় বেশী কষ্ট হইবে না।"

চিন্তাস্রোতপ্লাবিত, চঞ্চল মস্তিষ্ককে স্থির করিবার জন্য, শাহজাদা নিকটস্থ এক ক্ষুদ্র স্বর্ণভৃঙ্গার হইতে, প্রয়োজনমত সেরাজী ঢালিয়া পান করিলেন। তাঁহার চিত্তের মধ্যে যে নিরাশাজনিত একটা ঝড়ের আঁধার ঘোর করিয়া উঠিতেছিল, সেটা কাটিয়া গেল।

সহসা এই শান্ত নিশীথে, দূরশ্রুত একটা করুণ ক্রন্দনশব্দের প্রতিধ্বনি, নৈশপবন তাঁহার শিবিরকক্ষমধ্যে পৌছাইয়া দিল। কণ্ঠস্বর যেন রমণীর। শাহজাদা ভাবিলেন, এ গভীর রাত্রে এই নির্জ্জন বনপ্রদেশে চীৎকার করিয়া কাঁদে কে?

তখনই বক্ষবসন মধ্য হইতে এক ক্ষুদ্র বংশী বাহির করিয়া দানিয়েল তাহাতে মৃদুভাবে ফুৎকার দিলেন। বংশীর শব্দাবসানের সঙ্গেসঙ্গেই, দুইজন শরীররক্ষী আসিয়া কুর্নীস করিয়া বলিল,—"কি হুকুম! জনাবালি!"

দানিয়াল কৌতুহলপূর্ণ মুখে বলিলেন—"দেখ! এইমাত্র কোন স্ত্রীলোককে ক্রন্দন করিতে শুনিয়াছি। আমার শিবিরের পাশ হইতেই শব্দটা আসিয়াছে। একবার সন্ধান লও দেখি, ব্যাপারটা কি? যদি কাহাকেও দেখিতে পাও, সঙ্গে

করিয়া লইয়া আসিও। খবরদার! তাহাকে কোনরূপ ভয় দেখাইও না।"

প্রহরীদ্বয় তখনই কুর্ণীস করিয়া সেইস্থান ত্যাগ করিল। প্রায় দশ মিনিট পরে, তাহারা এক স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া কক্ষমধ্যে হাজির করিল।

সেই অপরিচিতা রমণী যুবতী। সে শাহাজাদার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াই, কান্না আরম্ভ করিয়া দিল। শাহজাদা সবিস্ময়ে দেখিলেন, কিশোরযৌবনসন্ধিগতা এক পরমা সুন্দরী, অথচ দরিদ্র পাহাড়ী রমণী—তাঁহার সম্মুখে। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে বলিলেন,—"কোন ভয় নাই তোমার! কে তুমি? তোমার পরিচয় দাও।"

যুবরাজের মিষ্ট কথায়, সেই যুবতী যেন একটু শান্তভাব ধারণ করিয়া বলিল,—"আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে। তুমি আগে আমায় কিছু খাইতে দাও।"

শাহজাদা বুঝিলেন—এই রমণী সামাজিক সভ্যতার গণ্ডীর বাহিরে পালিতা ও রাজপুরীর আদবকায়দার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা বিহীনা। সভ্যসমাজের আদবকায়দার বাহিরে পালিতা, সামান্য অবস্থার পল্লীরমণীর স্বভাব যেমন হয়, এর স্বভাবও সেইরূপ। রাজা, রাজপুত্র ও ওমরাহ শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত লোককে কি করিয়া সম্ভাষণ করিতে হয়, তাহা ইহারা জানে না।

সম্রাটপুত্র প্রসন্নমুখে বলিলেন—"তুমি স্থির হইয়া অইখানে বসো। তোমার খাদ্য ও পানীয় আনাইয়া দিতেছি।"

সেই যুবতী স্থির হইয়া এক মখমল-মণ্ডিত আসনে বসিয়া, অতি নির্ব্বোধের ন্যায় একটা ঔৎসুক্যপূর্ণ দৃষ্টিতে, সেই শিবির কক্ষের সজ্জা গুলি দেখিতে লাগিল।

শাহজাদার ইঙ্গিতে সেই দুইজন শরীররক্ষী তখনই রাজ ভোগোচিত মুখরোচক খাদ্য আনিয়া, সেই রোরুদ্যমানা যুবতীর সম্মুখে রাখিয়া শিবির কক্ষ ত্যাগ করিল। তার অল্পক্ষণ পরেই দুইজন বাঁদি স্বর্ণপাত্রে স্নিগ্ধপানীয় ও সরবতাদি আনিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিল।

সেই পাহাড়িয়া গ্রাম্য-যুবতী—কৌতুহলপূর্ণ দৃষ্টিতে স্বর্ণা-লঙ্কার খচিত সেই বাঁদীদের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া, বিস্ময়পূর্ণ মুখে বলিল—"এরা তোমার কে ?"

শাহজাদা। এরা আমার বাঁদী।

যুবতী। তুমি কে ?

শাহজাদা। সে পরিচয় পরে দিব। তুমি আগে খানাপিনা করিয়া ঠাণ্ডা হও।

সেই যুবতী খাদ্য পাত্র হইতে বাছিয়া বাছিয়া দুই চারি রকম জিনিস্ খাইল। তাহার খাইবার ভঙ্গীটাও যেন উন্মাদিনীর মত। খাইবার সময়, একবার সে হাসে, একবার বা গম্ভীর ভাব ধারণ করে। খাদ্য গুলির কতক সে কক্ষমধ্যে ছড়াইল, কতক খাইল, আবার কতকগুলি চট্‌কাইয়া নষ্ট করিল। তৎপরে ভৃঙ্গার হইতে সামান্য মাত্র স্নিগ্ধ সুবাসিত পানীয় পান করিয়া, বিরক্তির সহিত পাত্রটী যথাস্থানে রাখিয়া দিল।

শাহজাদা বুঝিলেন—এই দরিদ্রা যুবতীর চিত্তের অবস্থা ও কার্য্যের ভঙ্গী, যেন উন্মাদিনীর মত। আহারাদির পর একটা তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া, সেই কক্ষের চারিদিকে উদাসদৃষ্টিতে দুই চারিবার চাহিয়া, সে শাহজাদাকে প্রশ্ন করিল—"বলনা—এবার, তুমি কে?"

"তুমি কে?" এই সম্বোধনে, দিল্লীশ্বরপুত্র মধুর হাস্য করিয়া বলিলেন—"আগে বল তুমি কে?"

সেই যুবতী বলিল—"আমি মুন্না?"

"মুন্না বলিলে বুঝিব কিরূপে? তুমি থাক কোথায়?"

"এই পাহাড়ের জঙ্গলে এক নিভৃত কুটীর মধ্যে।"

"এতরাত্রে তুমি এখানে আসিলে কিরূপে?"

"পথ ভুলিয়া!"

"এ জঙ্গলের মধ্যে আসিয়াছিলে কেন?"

"কাঠ সংগ্রহ করিতে—আর ফল কুড়াইতে।"

"কাঁদিতেছিলে কেন?"

"ক্ষুধার জ্বালায়।"

"এখন ক্ষুধা নিবৃত্তি হইয়াছে?"

"না—ও সব খাবার আমরা পছন্দ করি না।"

"কিরূপ খাবার পছন্দ কর?"

"বজ্‌রার পোড়ারুটি, আর কিছু ভাজি আর তার সঙ্গে খাট্টাই আর চিড়িয়ার কাবাব।"

"ভাল—আজ রাত্রে তুমি এখানে থাক। কাল সকালে

তোমার পছন্দসই খাবারের ব্যবস্থা করিয়া দিব। তারপর তোমাকে লোক সঙ্গে দিয়া, তোমার বাড়ীতে পৌছাইয়া দিব। তোমার বেশ ভূষা দেখিয়া বুঝিতেছি, তুমি পাঠান-কন্যা। তাহা হইলেও বোধ হয়, আমাদের এখানে একরাত্রি থাকিতে, তোমার কোন আপত্তি থাকিতে পারে না।"

"তোমার পরিচয় না জানিলে আমিত এখানে থাকিতে পারিব না। তুমি আমাকে অতকথা জিজ্ঞাসা করিলে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তোমার পরিচয় দিলে না। তাজ্জব যাই হোক্!"

শাহজাদা পূর্ব্ববৎ মধুরহাস্য করিয়া বলিলেন—"আমি বাদশাহ পুত্র!"

যুবতী বলিল—"কোন বাদশাহ ?"

শাহজাদা বলিলেন—"আমি হিন্দুস্থানের বাদশাহ আকবর শাহের তৃতীয় পুত্র।"

যুবতী বিকট দৃষ্টিতে শাহজাদার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"ওঃ! এতক্ষণে বুঝিয়াছি। তুমি আফ্‌জাই পাঠানদের সঙ্গে লড়াই করিতে আসিয়াছ। আমাদের সোণার দেশকে আগুণে জ্বালাইয়া দিতে আসিয়াছ। আমাদের তুষারসিক্ত পাথরগুলিকে শোণিত-স্রোতে প্লাবিত করিতে আসিয়াছ। আমাদের বাদশাকে ধরিতে আসিয়াছ। কেমন একথা সত্য কিনা ?"

শাহজাদা। সত্যই তাই!

যুবতী। তুমি তা কখনই পারিবে না। মোগল! তুমি পাঠানকে বোধ হয়, খুব ভাল করিয়া চিনিবার সুযোগ পাও

নাই। যাক্—তোমাদের জয়পরাজয়ের মীমাংসার কর্ত্তা ঐ খোদা। আমায় কিছু ভিক্ষা দাও। আমি চলিয়া যাই। দুনিয়ার পয়দাকর্ত্তা আমাকে কাঠুরিয়ার কন্যা করিয়া পাঠাইয়াছেন। রাজা বাদশার কথায় আমার কাজ কি?

যুবতী আবার একটা ভ্রূকুটীভঙ্গী করিল। তারপর আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"বাদশার পুত্র তুমি! আমি ভিক্ষা চাহিলাম, কই আমায় ভিক্ষা দিলে না?"

"দিতেছি"—বলিয়া, শাহাজাদা দানিয়েল, তাঁহার সাঁচ্চা-খচিত মখ্‌মলের থলিয়া হইতে পাঁচটী চকচকে স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া, সেই যুবতীর সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন—"এই নাও।"

শাহজাদা হস্তটি অগ্রসর করিয়া দান করিতে গেলেন, কিন্তু সেই উন্মাদিনী সে দান লইল না। ঘৃণার সহিত তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিল—"বাদশাহী দান এই? পাঠানের রাজ্যে আজকাল মোগলের টাকা চলে না, তা বোধ হয় তুমি জান না। সোনার টাকায় আমার কোন প্রয়োজন নাই।"

শাহজাদা বলিলেন—"তাহা হইলে কি চাও তুমি?"

যুবতী। তোমার হাতে ওটা কি চক্ চক্ করিতেছে?

শাহজাদা। হীরার আংটী।

যুবতী। ওটা আমায় দাও! দেখতে খুব চক্‌চকে।

শাহজাদা ভাবিলেন—এও এই উন্মাদিনীর ক্ষণিক খেয়াল। এজন্য সহাস্যমুখে বলিলেন—"এ বহুমূল্য অঙ্গুরী লইয়া তুমি কি করিবে?"

যুবতী। আমার আঙ্গুলে পরিব।

দ্বিধাসংকোচবিহীন হৃদয়ে, নিজের অঙ্গুলী হইতে সেই বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরীয় খুলিয়া, শাহজাদা দানিয়েল বলিলেন—"এই নাও। কিন্তু এই অঙ্গুরী তোমার অই সুন্দর হাতখানিতে আমি স্বহস্তে পরাইয়া দিব।"

"না—"বলিয়া যুবতী একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। শাহজাদা ভাবিলেন—এটা এই উন্মাদিনীর আর একটা নূতন খেয়াল। তাহার মতির স্থিরতা খুবই কম। গভীর নিশীথে, নির্জ্জন শিবিরের মধ্যে, এই অদ্ভুত উন্মাদিনীকে লইয়া তিনি যেন খুব একটু আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। সুতরাং বলিলেন, তোমার হাতে পরাইয়া দিতে না দাও এই স্থানে রাখিয়া দিলাম—তুমি নিজেই পর। দেখি তোমায় কেমন দেখায়।"

সেই যুবতী অঙ্গুরীয়টী তুলিয়া লইয়া, দুই চারি বার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া, তাহার আঙ্গরাখার মধ্যে রাখিয়া, গম্ভীর মুখে বলিল,—"কাল দিনের বেলায় এটা একবার ভাল করিয়া দেখিব। যদি পছন্দ না হয় বা ঝুটা জিনিষ হয়, তাহা হইলে তোমায় ফিরাইয়া দিয়া যাইব।"

উন্মাদিনী বসিয়াছিল—উঠিয়া দাঁড়াইল। শাহজাদা বলিলেন, "কোথায় যাও তুমি ?"

উন্মাদিনী বলিল,—"এ তাঁবু বড় গরম। এত উজ্জ্বল আলো আমার চোখে সহে না। এত ভাল শয্যায় আমার ঘুম

হয় না। আমার পক্ষে কঠিন মাটীর শয্যা আর তাহার উপর গাছের শুখ্‌নো পাতায় বিছানা বড়ই উপাদেয়।”

শাহজাদা বলিলেন,—“তোমাদের রাজপুরী এখান হইতে কত দূর। আমি তোমার এত কথার জবাব দিলাম, আর তুমি আমার একটা ছোট খাটো প্রশ্নের জবাব দিবে না?”

উন্মাদিনী বলিল,—“পাহাড়টা ঘুরিয়া গেলে এখান হইতে চার পাঁচ ক্রোশ। কিন্তু এই তাঁবুর বাহিরে দাঁড়াইলেই এতদুর হইতেও বোধ হয় আমাদের বাদশার প্রাসাদের চূড়া দেখা যায়। আমার সঙ্গে এস। এই রাত্রেই তোমাকে আমাদের বাদশার বাড়ী দেখাইয়া দিতেছি।”

সেই উন্মাদিনী আর কিছু না বলিয়া, দ্রুতপদে শিবিরের বাহিরে আসিল। শাহজাদা উপায়ান্তর বিহীন হইয়া, তাহার অনুসরণ করিলেন।

সহসা শিবির দ্বার হইতে একটু দূরে আসিয়া, সেই উন্মাদিনী-আকাশের দিকে অঙ্গুলি হেলাইয়া বলিল,—“অই অদূরে একটা নীল তারা জ্বলিতেছে—দেখিতেছ?”

শাহজাদা মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন,—“তারা কি কখনও নীলবর্ণের হয়?”

“আমাদের দেশে তা হয় বই কি—ঐ গাছ দুইটার মধ্য দিয়া চাহিয়া দেখ, পাহাড়ের অই চূড়ার মাথায় কেমন উজ্জ্বল একটা নীল আলো জ্বলিতেছে। ঐ আলোকেই আমরা “নীলতারা” বলি।”

শাহজাদা দেখিলেন, উন্মাদিনী মিথ্যা বলে নাই। খুব দূরে তারকাখচিত অখণ্ড নীলাকাশের নীচে, সত্যই একটী উজ্জ্বল নীল আলোক জ্বলিতেছে।

শাহজাদা কিয়ৎক্ষণ সেই আলোকের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া থাকিবার পর বলিলেন,—"ঐ আলো কি মীরাণশার রাজ-প্রাসাদের ?"

এ কথার কেইবা উত্তর দিবে ? শাহজাদা সবিস্ময়ে দেখিলেন,—সেই উন্মাদিনী. ছায়ামূর্ত্তির মত সহসা অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। তিনি শিবিরের আশেপাশে তাহার সন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন অস্তিত্বই তাহার নাই।

শাহজাদা—বিস্মিতচিত্তে শিবিরকক্ষে ফিরিয়া আসিয়া প্রহরীদের বলিলেন, "সেই পাগ্‌লী এই অন্ধকারের মধ্যে কোথায় পলাইয়া গিয়াছে। তোমরা একটু চেষ্টা করিয়া দেখ, তাহাকে দেখিতে পাও কিনা? আহা! বেচারার অবস্থা দেখিয়া আমার বড়ই দয়া হইতেছে।"

প্রহরীদ্বয় তখনি চলিয়া গেল। জ্বলন্ত মশালহস্তে তাহারা বহুক্ষণ ধরিয়া সেই পাহাড়ের বন জঙ্গলের আশেপাশে খুঁজিল ; মনিবের হুকুমে তাহারা অনেকটা সময় অপব্যয় করিল বটে, কিন্তু সে রাত্রে কোথাও সেই উন্মাদিনীর সন্ধান পাইল না।

আর সেই উন্মাদিনী, অন্ধকারের মধ্যে সহসা অদৃশ্য হইবার পর, জঙ্গল পার হইয়া পাহাড়ের একটী বাঁকের মুখে আসিল।

এই স্থানে এক ক্ষুদ্র ঝোপের আড়ালে. দুইজন বলিষ্ঠদেহ

অস্ত্রধারী বাহক, একখানি ক্ষুদ্র ডুলি লইয়া পূর্ব্বোক্ত বাঁকের মুখে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

সেই উন্মাদিনী তাহাদের সম্মুখে আসিবামাত্রই, তাহারা সসম্ভ্রমে সেলাম করিয়া বলিল,—"এখন হুকুম কি মা?"

সেই রমণী বলিল,—"সোজা পথে আমায় খুব শীঘ্র প্রাসাদ-মধ্যে পৌছাইয়া দে।"

এক ঘণ্টার কম সময়ে, বাহকেরা আফজাই-সর্দ্দার মীরাণ-শার অন্দরমহলের গুপ্তদ্বারে শিবিকাসমেত পৌঁছিল। সেই রমণী শিবিকা হইতে নামিয়া ত্রস্তগতিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জানি না—এই উন্মাদিনী যুবতী কোন কুহকিনী কিনা? কেননা, কক্ষ প্রবেশের পর তাহার আর সে মূর্ত্তি নাই। মলিন-বাসের পরিবর্ত্তে, এখন তাহার লাবণ্যময় দেহ সাঁচ্চার কাজকরা পেশোয়াজ, আংরাখা ও বহুমূল্য ওড়নায় আবৃত হইয়াছে।

রাত্রি তখন দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সমস্ত কক্ষ স্নিগ্ধ ও সুগন্ধি আলোকে উজ্জ্বলিত। আর শিবির মধ্যে পরিদৃষ্টা, রোরুদ্যমানা, সেই উন্মাদিনী, মায়াবলে এখন এক পরমাসুন্দরী যুবতীতে পরিবর্ত্তিত। সেই কক্ষে ছিল—সে আর তার বাঁদী। তার নাম মুনিয়া বা মুন্না।

মুনিয়া বলিল,—"সাবাস! সাহস তোমারি পান্না বিবি! এই

পবিত্র জুম্মাবারে গেলে কিনা পীড়-পাহাড়ে শিরনী দিতে। আর ফিরিবার সময়ে এমন একটা কাণ্ড করিয়া আসিলে—তাহা বোধ হয়, কোনও কৌশলী বীরপুরুষেও পারে না। তোমার হুকুম পাইয়াই আমরা চলিয়া আসিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তুমি ফিরিয়া না আস পর্য্যন্ত, বড়ই উৎকণ্ঠায় এখানে আমাদের সময়টা কাটিয়াছে। আচ্ছা সাহস—তোমার যাই হোক্!"

এইরূপ প্রসংশাবাদে, সেই সুন্দরী একটু মুখ মুচকিয়া হাসিয়া একবার সম্মুখস্থ দর্পণের দিকে চাহিয়া বলিল,—"বাবা আজকে আমার কোন খোঁজ খবর করেন নাই ত মুন্নিয়া?"

মুনিয়া বলিল,—"না—একবারও না! খোদা আমাদের উপর খুবই সদয়। অন্য দিনের মত তিনি আজ আর তোমার সন্ধানে এ মহলে আসেন নাই। আচ্ছা! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি সেই ছদ্মবেশ কোথায় পাইলে পান্নাবিবি?"

এই যুবতীর নাম পান্নামতি। আফ্‌জাই-সর্দ্দার দুর্গাধিপতি মীরণশাহের একমাত্র কন্যা ইনি।

পান্না বলিল,—"পীরপাহাড়ে ফকিরের আস্তানায় যাওয়া আমার একটা বাজে অছিলা বই ত নয়! মোগলেরা এবার কত সেনা আনিয়াছে, আর তাহাদের সমূলে ধ্বংশ করিতে আমাদের কতটা পরিশ্রম করিতে হইবে, সেই সংবাদটা সংগ্রহ করিবার জন্যই এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছি। খোদা বড়ই মেহেরবান্—তাই শত্রুশিবিরে গিয়াও কোনরূপ বিপদ ঘটে নাই।

মুন্না। যদি ঘটিত, আর তোমার ছদ্মবেশ ধরা পড়িত—তাহা হইলে কি হইত বিবি ?"

পান্না। দেখ্ মুন্নি ! পাঠান-রমণীকে শক্তিবলে আটক করিয়া রাখিতে পারে, এমন মোগল বোধ হয় আজও জন্মে নাই।

মুন্না বলিল,—"ভাল কথা ! তুমি তাহাদের শিবিরে প্রবেশ করিলে কিরূপে ?"

পান্না বলিল,—"কি করিয়া ছদ্মবেশ ধারণ করি, তাহা ত তুই দেখিয়াছিস্ মুন্নি ! তোর হাতে আমার পরিধেয়গুলি পাঠাইয়া দিয়া, যে ছদ্মবেশ আমার সঙ্গে ছিল, তাহার সহায়তায় পাহাড়ী কাঠুরিয়ার বেশে জঙ্গলে ঢুকিলাম। তারপর যাহা করিলাম, তাহা সত্য সত্যই একটা অভিনয়ের ব্যাপার !"

এই কথা বলিয়া পান্না সেই রাত্রের সমস্ত ঘটনা, মুনিয়াকে এক নিশ্বাসে বলিয়া গেল। মুনিয়া গালে হাত দিয়া বিস্মিতস্বরে বলিল,—"অবাক্ কল্লে যাই হোক্ ! আমাদের বাদশার বড়ই আফ্‌শোষ, যে তাঁর একটীও সন্তান নাই। তা তুমি আজ যে কাজ করিয়া আসিলে—তাহা উপযুক্ত বীরপুত্রের কাজই বটে। কাল আমি মহলের সর্দ্দারের নিকট শুনিয়াছি, আমাদের গোয়েন্দারা অনেক চেষ্টা করিয়াও মোগলের ঘাটিতে গুপ্তভাবে প্রবেশ করিয়াও এবার কোন সংবাদই আনিতে পারে নাই।"

পান্না সে রাত্রে অনেকটা পরিশ্রম করিয়াছে—সুতরাং সে বড়ই শ্রান্ত। এজন্য সে বলিল,—"মুনিয়া ! রাত অনেক হইয়াছে এখন শোয়া যাক্ চল্।"

উভয়ে শয্যায় গিয়া শুইল। চিরদিনই তাহারা একত্রে শয়ন করে। মুনিয়া বলিল,—"আর একটী কথা শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে। আমাদের দুষ্‌মন্ এই মোগল রাজপুত্রকে দেখিতে কেমন বল দেখি ?"

পান্না হাসিয়া বলিল,—"অতি সুপুরুষ। মুখ চোখ সব যেন তুলি দিয়া আঁকা। আর ব্যবহারে তিনি অতি অমায়িক। আমি ত আগাগোড়াই "তুমি—আমি" করিয়া কথা কহিয়া আসিয়াছি। কিন্তু তিনি একটুও তাহাতে রাগ করেন নাই। যদি এবার লড়াইয়ে আমাদের জিত হয়, আর ঐ মোগল শাহজাদা আমাদের বন্দী হন, তাহা হইলে তাঁর সঙ্গেই তোর সাদি দিব।"

মুনিয়া হাস্য মুখে বলিল,—"রঙ্গ দেখো! আমার মত বাঁদিতে বাদশাজাদাকে সাদি করিতে গেল কেন? এমন কি পাপের ভোগ আমার! আমরা বাঁদী মানুষ। একটা বান্দা গোছ আদমি পাইলেই, জীবনটা হাসিখুসীতে কাটিবে। তুমি বাদ্‌শাজাদা। ঐ বাদ্‌শাজাদা তোমারই!"

এইরূপ রহস্যালাপের পর, উভয়ে নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিল! আর উপযুক্ত অবসর পাইয়া, নিদ্রাদেবী তাহাদের দুইজনের চোখে মোহাঞ্জন পরাইয়া দিলেন।

প্রভাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া, পান্না সর্ব্বাগ্রে তাহাদের ক্ষুদ্র প্রাসাদের মিনারের উপর উঠিল। সেখান হইতে দেখিবার চেষ্টা করিল, গতরাত্রে গভীর জঙ্গলের মধ্যে, সে যে

মোগল-শিবির দেখিয়া আসিয়াছে, তাহা মিনারশিখর হইতে দেখা যায় কি না ? কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্যক্রমে সে কিছুই দেখিতে পাইল না। কেননা, সেই ছাউনী পাহাড়ের অপর দিকে। পাহাড়ের উপত্যকায় বড় বড় গাছ আকাশ স্পর্শ করিয়াছে। সুতরাং মোগল স্কন্ধাবার দেখিবার কোন সম্ভাবনাই নাই। পান্না বুঝিল, চতুরতায় পাঠান অপেক্ষা মোগলই এবার শ্রেষ্ঠ দেখিতেছি।

মিনার হইতে নামিয়া, পান্না নিজের কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইতেছে, এমন সময়ে দালানের মধ্যে সে তাহার পিতার সাক্ষাৎ পাইল। মীরাণশাহ, গত রাত্রে নানা কাজের ভিড়ে কন্যার কোন সংবাদ লইতে পারেন নাই। তাই প্রভাতে অতি ব্যস্তভাবে, কন্যার কক্ষের দিকে আসিতেছিলেন।

কন্যা পান্না—পিতার হাত ধরিয়া সম্মানের সহিত তাহা চুম্বন করিয়া বলিল,—"ঘরের ভিতর এস বাবা ! তোমায় একটা খুব মজার জিনিস দেখাইব।"

আফ্‌জাই-সর্দ্দার মীরণশাহ, বিস্মিতমুখে কন্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"চল দেখি গে মা, তোমার কথিত এই তাজ্জব জিনিষটা কি ?"

দুর্গাধিপতির কন্যা, এই পান্নামতি বড়ই খামখেয়ালি। মীরণ-শাহ তাঁহার কন্যার অনেক অসম্ভব খেয়ালেও কখনও বাধা দিতেন না। কারণ—সে মাতৃহীনা। এই মাতৃহীনা কন্যাকে অতি শৈশব হইতে বুকে করিয়া, স্নেহ ও আদর দিয়া, তিনি মানুষ করিয়া-

ছেন। প্রাণের ষোল আনা আদর যত্ন ঢলিয়া, নিজের সুখ-স্বচ্ছন্দ সব ভুলিয়া, এই মাতৃবিয়োগবিধুরা বালিকা কন্যাকে এত বড় করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার সমপদস্থ অনেক সামন্তরাজগণ তাঁহার একমাত্র কন্যাকে পুত্রবধূ করিয়া ভাগ্যবান হইবার জন্য, প্রস্তাব করিয়াছিলেন—কিন্তু পাছে এই স্নেহময়ী প্রাণাধিকা কন্যাকে চোখের আড়াল করিতে হয়, এই ভয়ে তিনি তাঁহাদের কাহারও প্রস্তাবে তখনও পর্য্যন্ত সম্মতি দান করেন নাই।

পান্না, পিতাকে লইয়া তাহার কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। মীরণশাহ আসন গ্রহণ করিয়া সহাস্যমুখে বলিলেন—"কি তোমার তাজ্জব জিনিষ দেখি পান্নামতি ?"

পান্না, এক হস্তদন্ত নির্ম্মিত ক্ষুদ্র কৌটার মধ্য হইতে একটী বহুমূল্য অঙ্গুরীয় বাহির করিয়া তাহার পিতার সম্মুখে ধরিল।

মীরণশাহ দেখিলেন—অঙ্গুরীয়টী বহুমূল্য হীরক-গ্রথিত ! এরূপ দামী হীরক, তাঁহার রাজ-ভাণ্ডারে নাই। আর কন্যা পান্নাকেও কখনও তিনি এরূপ কোন অঙ্গুরীয় উপহার দেন নাই। তাহা হইলে এ বহুমূল্য অঙ্গুরীয় পান্না পাইল কোথায় ?"

মীরণশাহ বিস্মিত মুখে বলিলেন,—"এ বহুমূল্য অঙ্গুরীয় তুমি কোথায় পাইলে পান্না ?"

পান্না গম্ভীরমুখে বলিল,—"ভিক্ষার দানরূপে, এ অঙ্গুরীয় লাভ করিয়াছি।"

মীরণশাহ ঘৃণাপূর্ণ স্বরে বলিলেন,—"কে সে এতবড় দাতা,

যে এই পাহাড়ের একচ্ছত্র অধিপতি, বাদশা মীরণশার কন্যাকে ভিক্ষা দিতে পারে ?"

পান্না সহাস্যমুখে বলিল,—"পারে বই কি বাবা! যে আমাদের পাহাড়ের খুব কাছে আসিয়া, তাহার নিজের ধ্বংশ প্রতীক্ষা করিতেছে, সেই আকবর বাদশার পুত্র সুলতান দানিয়েল, আমায় এ অঙ্গুরীয় ভিক্ষা দিয়াছেন।"

তখন পিতাকে আর অযথা ঔৎসুক্যের মধ্যে না রাখিয়া, পান্না তাঁহার নিকট গত রাত্রের সমস্ত ব্যাপার একে একে বলিয়া ফেলিল।

মীরণশাহ, অঙ্গুরীয়টী ভাল করিয়া পরীক্ষার পর তাহার ভিতরের দিকে সুলতানের নাম খোদিত দেখিয়া খুবই বিস্মিত হইলেন। তাঁহার কন্যার অদ্ভূত সাহসের পরিচয় পাইয়া বলিলেন,—"আজ সত্যই তুই আমার পুত্রের কাজ করিয়াছিস্ পান্নামতি! আমার তিনজন বিশ্বাসী গোয়েন্দা, প্রায় পাঁচ সাত দিন ঘুরিয়া এই মোগল-শিবিরের সম্বন্ধে কোন বিশেষ সংবাদই আনিতে পারে নাই। কিন্তু মা! গতরাত্রে যাহা করিরাছ, তাহার ত কথাই নাই। কিন্তু এরূপ দুঃসাহসের কাজ আর করিও না।"

পান্না সহাস্য মুখে বলিল,—"কিসের ভয় পিতা! খোদা আমার সহায়। আর এ কথাও জানি, পাঠান সর্দার মীরণশার কন্যা আমি।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

"কে তুমি? ঐখানে স্থির হইয়া দাঁড়াও। অগ্রসর হইলেই মৃত্যু!"

স্বর রমণী কণ্ঠের। যাঁহার কাণে এই কথাগুলি পৌঁছিল—তিনি একজন অস্ত্রাদিশোভিত বীরপুরুষ।

এই বীরপুরুষ, অস্ফুটস্বরে বলিলেন—"কে—কোথা হইতে এ কথা বলিল? কই কেউ ত এখানে নাই।"

চারিদিকে গগনস্পর্শী পাহাড়। আশেপাশে, সম্মুখে পশ্চাতে, বামে দক্ষিণে, কঠিন পাষাণস্তূপ। সেই জন্য ঐ কথাগুলির প্রতিধ্বনিও উঠিয়াছিল—খুব সুস্পষ্ট। মধ্যাহ্নে সমুজ্জ্বল সূর্য্যকিরণ সম্পাতে, পাষাণস্তূপ যেন পাঁজার মত অনলস্পর্শ হইয়া উঠিয়াছে।

সেই অস্ত্রধারী বীরপুরুষ, একবার চমকিতনেত্রে চারিদিকে চাহিলেন। তিনি কোথায় কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। একবার ভাবিলেন, হয় ত তাঁহার শুনিবার ভ্রম! আবার ভাবিলেন- জিনের নয়, পরীর নয়, মানুষের কথাই ত স্পষ্ট শুনিয়াছি। কণ্ঠস্বর রমণীর। কথা রমণীর। এ সাবধানবাণীও রমণীর। তবে এ কি কোন বনদেবীর সতর্কবাণী?

সেই সৈনিক তাহার কপালের স্বেদরাশি মুছিয়া, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, আবার একটু অগ্রসর হইলেন।

আবার রমণীকণ্ঠে সেই সাবধান বাণী—"স্থির হও! অইখানে দাড়াও! অগ্রসর হইলেই মৃত্যু।"

সেই অস্ত্রধারী যুবক, অগত্যা স্থিরভাবে সেইখানে দাঁড়াইলেন। কে যেন তাঁহার পা দুটীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দিয়াছে। তিনি আকুলকণ্ঠে বলিলেন—"কে তুমি? কোথায় তুমি? কেন এ ভাবে আমায় সাবধান করিতেছ? তুমি কি কোন বনদেবী?"

সহসা—এক পরমা সুন্দরী রমণী মূর্ত্তি, সেই যুবকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল! যে আসিল—সে অতি সুন্দরী। যৌবন তাহার সমস্ত অঙ্গে তরল ও সমুজ্জল লাবণ্য ঢালিয়া দিয়াছে। আগুলফ্‌লম্বিত কৃষ্ণকেশরাশি, নলিনীরাগলাঞ্ছিত অপূর্ব্ব বদন-শোভা, বিদ্যুদ্দামতুল্য কটাক্ষ—স্ফুরিতাধরে ঘৃণাপূর্ণ হাসি! হস্তে তীরধনু, আর কটিদেশে আবদ্ধ ছুরিকা!

এই অস্ত্রধারী যুবক, তাহাকে দেখিয়া খুবই বিস্মিত হইলেন। চকিতদৃষ্টিতে বারেকমাত্র তাহার সর্ব্বাঙ্গের ঢলঢলায়মান সৌন্দর্য্য দেখিয়া লইয়া বলিলেন—"কে তুমি?"

রমণী তিরস্কার পূর্ণ স্বরে বলিল—"মোগল! তুমি কি শিষ্টতা শিক্ষা কর নাই? নিজের পরিচয় না দিয়া, আগে রমণীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছ? দেখিতেছি—অতি বেয়াদব্ তুমি!"

যুবক সেই প্রগল্‌ভা রমণীর কথায় অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন—"তুমিই কি আমায় অগ্রসর হইতে নিষেধ করিতেছিলে?"

রমণী। হাঁ—আমি?

যুবক। কেন?

রমণী। তুমি চোরের মত এ স্বাধীন রাজ্যের সীমায় প্রবেশ করিয়াছ কেন মোগল সেনাপতি ?"

যুবক। কে বলিল—আমি মোগল ?

রমণী। মোগলকে আমরা খুব চিনি। তাহাদের গতি, বন্য মার্জ্জারের অপেক্ষাও সতর্ক! বহুদিন হইতেই মোগলকে আমরা চিনিয়া আসিতেছি—কেননা মোগল-বাদশা আকবর শাহের সঙ্গে আমাদের একবার শক্তি পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। মোগল সৈনিক! রমণী হইয়াও আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, তুমি যে সে মোগল নয়—আকবর বাদশার গুপ্তচর!

যুবক বলিল—"রমণী! বিধাতা যে তোমায় কেবল অতুল রূপসম্পদে গরবিনী করিয়াছেন—তাহা নয়। তুমি অতি সুচতুরা—অতি বুদ্ধিমতী! কিন্তু তোমার মত এ পাঠান রাজ্যে আর কেউ আছে কি ?"

রমণী বিদ্রূপপূর্ণ স্বরে বলিল—"আছে বই কি? ঘরে ঘরে আমার মতন অনেক পাঠান রমণী তুমি দেখিতে পাইবে।"

যুবক কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া সস্মিতবদনে বলিলেন—"আমি তোমার পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি। আমার মনে বড়ই সন্দেহ হইতেছে!

রমণী। কিসের সন্দেহ!

যুবক। তুমি বোধ হয়—আফ্‌জাইসর্দার মীরন্‌শার কন্যা!

রমণী একটু দর্পিত ভাবে বলিল—"তোমার অনুমান সত্য!

সত্যই আমি মীরনৃশার একমাত্র কন্যা—পান্নামতি। কিন্তু তোমার নাম কি ?"

যুবক। নানাকারণে আমি তাহা বলিতে অনিচ্ছুক !

রমণী। তাহা হইতেই পারে না। হইতেও দিব না। আমার এই তূণীরনিক্ষিপ্ত বিষাক্ত তীর, এখনি তোমাকে পরিচয় দানে বাধ্য করিবে। এই কথা বলিয়া—সেই রমণী একটু হাসিল। সে হাস্য যেন কঠোর বিদ্রূপপূর্ণ।

যুবক। আর তোমার তূণীর হইতে, ঐ বিষাক্ত তীর ধনুকের ছিলায় সংজোজিত হইবার পূর্ব্বেই, আমার তরবারি তাহা দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিবে।

"বটে !" বিদ্রূপের সহিত ভ্রূভঙ্গী করিয়া, পান্না ক্ষিপ্র হস্তে তাহার তূণীর মধ্য হইতে এক শাণিত তীর বাছিয়া ধনুতে জুড়িল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই তীর মহাবেগে অব্যর্থ লক্ষ্যে ছুটিয়া গিয়া, সেই মোগল সৈনিকের উষ্ণীস উড়াইয়া দিল।

যুবক সৈনিক, বিস্মিতভাবে, পান্নার মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—"পাঠানের তীর যে মোগলের তরবারির অপেক্ষা দৃঢ়লক্ষ্যসম্পন্ন, তাহা আজ বুঝিলাম।"

পান্না তখনই ছুটিয়া গিয়া উষ্ণীসটী কুড়াইয়া আনিয়া, সেই যুবকের হাতে তুলিয়া দিল। সহাস্য মুখে বলিল—"পাঠান রমণীর অব্যর্থ লক্ষ্যশক্তি ত দেখিলে ? এখনও পলাইবার সময় আছে। এখনিই পাহাড়ের নীচে নামিয়া যাও। আমি তোমায় অবতরণের সহজ পথ দেখাইয়া দিতেছি। আমার তীর তোমার

পাগড়ী উড়াইয়া দিয়াছে, কিন্তু সর্দ্দার মীরন্‌শাহের সেনাদের শাণিত তরবারির মুখে পড়িলে, তোমার মাথাটা কাঁধ হইতে উড়িয়া যাইবে।

সেই বিস্ময়বিমুগ্ধ যুবক, মনে মনে কি ভাবিয়া সহসা গম্ভীর-ভাব ধারণ করিয়া বলিলেন "আমি ত একা "আসি নাই বিবি! পাঁচশত মোগল-সেনা, এই পাহাড়ের নীচে আমার আদেশ অপেক্ষা করিতেছে।"

সেই রমণী বলিল—"আর পঞ্চাশ জন আফগাই পাঠান আমার পিতার অই প্রাসাদের বারান্দার নীচে বসিয়া, আনার ও আঙ্গুরের রস খাইতেছে। তাহাদের তরবারিতে শান দিতেছে! আমি একবার বংশীধ্বনি করিলে, তাহারা এখনই এই পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া, তোমার পাঁচশত সেনার মোহাড়া লইবে! এই পাঠানের শক্তির পরিচয় ত তোমাদের মোগলবাদশা পূর্ব্বে পাইয়াছেন। অতি নিল্লর্জ্জ তোমার প্রভু সেই আকবরশাহ, যে একবার লাঞ্ছিত হইয়াও আবার তিনি তোমাদের পাঠাইয়াছেন।"

সেই যুবকসৈনিকের মনে একটা মহাদুরাশার সঞ্চার হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন—"যে কোন উপায়ে হৌক এই রমণীকে আয়ত্ত করিতে হইবে! আমার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইহাকে হত্যা করিতে হয় তাহাতেও আমি প্রস্তুত। যখন এতটা আসিয়াছি, কার্য্যফল যখন প্রায় হস্তগত, তখন কর্ত্তব্যচ্যুত হইলে আমি কেবল আকবর বাদশাহের নয়, খোদারও কোপে পড়িব।"

এই ভাবিয়া, সেই সৈনিক একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "পিয়ারে! দেখিতেছি—তুমি খুবই খাপ্‌সুরাত। ঠিক যেন বেহেস্তের পরী।"

পান্না মৃদু হাস্যের সহিত বলিল—"বলিয়া যাও, শেষ পর্য্যন্ত। দেখি, মোগলের প্রাণে সৌন্দর্য্যবোধ শক্তি কতদূর বেশী। রমণীর তোষামোদে সে কতটা সক্ষম।"

সেই মোগল-সেনানী মৃদু হাস্যের সহিত বলিলেন—"তুমি অতি নিষ্ঠুর। আমি তোমার রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়াছি। তোমাদের পাহাড়ের দেশে যে এরূপ সুন্দরী রমণী আছে, তাহা আজ দেখিলাম। জানি না—আমি কোন স্বপ্নরাজ্যে আসিয়াছি কিনা?"

পান্না বলিল—"বহুৎ খুব সাহেব! সত্যই তুমি স্বপ্নরাজ্যে আসিয়াছ। আর এখনই তোমার এ সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিবে!"

এই কথা বলিয়া, পান্নামতি, তাহার বক্ষঃমধ্য হইতে একটী ক্ষুদ্র বাঁশী বাহির করিয়া বাজাইল। বাঁশীর আওয়াজ বায়ুস্তরে মিলাইতে না মিলাইতে, পঁচিশ জন ভীমকায় পাঠান যোদ্ধা, তাহার সন্মুখে আসিয়া মাথায় তরবারি স্পর্শ করিয়া সসম্ভ্রমে সেলাম করিয়া বলিল—"কি হুকুম মা?"

পান্নার চক্ষুদ্বয় তখন জ্বলিতেছিল। সে কঠোর স্বরে সেই প্রহরীদের আদেশ করিল—"এই মোগল-সেনানীকে বন্দী করিয়া দুর্গাধিপতির নিকট লইয়া যাও। তাঁহাকে বলিও, তাঁহার কন্যা রূপে জন্মিয়া, এতদিন একটা কাজের মত কাজ করিতে পারি নাই। আজ তাহা করিলাম।"

সেই বিপন্ন মোগল সেনানী, বুঝিলেন—এ ক্ষেত্রে বাধা দেওয়ায় কোন ফলই নাই। ঘটনা স্রোত কোথায় যায়, তাহা শেষ পর্য্যন্ত দেখিতে তাঁহার বড়ই একটা কৌতুহল জন্মিল। তিনি পান্নার দিকে ঘৃণা পূর্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিলেন "ভাল! তোমাদের পাহাড়ের দেশে রমণীর প্রাণও যে পাষাণে গড়া, তাহা তোমার ব্যবহারেই এখন বুঝিলাম।"

পান্না—স্ফুরিতাধরে মধুর হাসি ফুটাইয়া, বিদ্রূপপূর্ণ স্বরে বলিল "আমার দেশের শত্রু যে মোগল, বীর-সেনানী হইয়া যে চোরের মত গুপ্তভাবে আমাদের এই চির স্বাধীনতার নিবাসকে কলঙ্কিত করিয়াছে—তাহার খেয়ালময় ভালবাসার প্রতিদান এইরূপেই দিতে হয়।"

পান্না, বিদ্যুৎবেগে অন্য একদিকে আর একটা কাজের জন্য চলিয়া গেল। প্রহরীরা সেই মোগল সেনানীকে আয়ত্ত করিয়া কারাগারে রাখিয়া, তাহাদের দেশাধিপতিকে সংবাদ দিল।

পান্নার মনটা, কিন্তু এরূপ একটা কাজ করিয়া বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল। কেন—তা সেই জানে।

পান্না জানিত—তাহার পিতার ক্রোধ অতি ভয়ানক। হয়তঃ তাঁহার আদেশে, এখনিই এই মোগল সেনাপতি অতি শোচনীয় মৃত্যুমুখে পড়িবে।

একটু আগে, সে নিজে চেষ্টা করিয়া যাহাকে ধরাইয়া দিয়াছে, যার তেজদৃপ্ত সুন্দর মুখখানি এখনও তাহার মনে পড়িতেছে, যে গুপ্তভাবে তাহার পিতার সর্ব্বনাশ করিতে

আসিয়াছিল, যে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে পারিলে, শোণিত স্রোতে ও ছিন্নমুণ্ডে এই উপত্যকা প্লাবিত হইত, তাহার উপর সহসা তাহার এ সহানুভূতি জন্মিল কেন? এ কথা পান্নাই জানে।

পান্নামতি—পাঠান কন্যা। পাষাণের প্রাচীরমধ্যে লালিত-পালিত ও পরিবর্দ্ধিত। এই জন্য কোমলপ্রাণা রমণী হইলেও তাহার প্রাণে একটা দৃঢ়তা, একটা কর্ত্তব্যবোধ, বড়ই প্রবল ভাবে জাগরূক ছিল।

স্বাভাবিক চিত্তসংযম প্রবৃত্তিকে সামান্য চেষ্টায় জাগরিত করিয়া, একটু আগে যাহা ঘটিয়া গিয়াছিল, তাহা যেন কিছুই নয় ভাবিয়া, পান্না তাহার সাধের গুলাব-বাগের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেই বাগান হইতে অঞ্চল ভরিয়া কতকগুলা বাছা বাছা গুলাব সংগ্রহ করিয়া, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী এক আঙ্গুরক্ষেতে নামিল। আঙ্গুরগাছে তখন প্রচুর ফল ধরিয়াছে। সে অতি সাবধানে অতি সন্তর্পণে, আঙ্গুরস্তবকগুলি ছিন্ন করিয়া লইয়া, ধীর গতিতে, চিন্তাপূর্ণ মুখে তাহার মহলে প্রবেশ করিল।

পান্না মাতৃহীনা। তাহার একটীও সহোদর নাই। পিতার বিশাল পার্ব্বত্য-রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী সে—যদি তাহা এই মোগলবাদশাহ আকবরশাহের লোলুপনেত্র হইতে এবার উদ্ধার পায়।

পান্না নিজের কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, দর্পণে একবার তাহার সুন্দর মুখখানি দেখিল। চূর্ণ অলকা এদিকে ওদিকে সরিয়া পড়িয়াছিল। দর্পণ সম্মুখে দাঁড়াইয়া, সেগুলি ঠিক করিয়া

লইল। তারপর তাহার সংগৃহীত আঙ্গুরগুচ্ছ হইতে দুই চারিটি আঙ্গুর খুলিয়া লইয়া মুখে দিয়া বলিল—"বা! কি মিষ্ট!"

একটী রৌপ্যনির্ম্মিত ফুলদানে, তাহার সংগৃহীত বড় বড় গুলাবগুলি সযত্নে সাজাইয়া রাখিয়া, দুইটী বড় ফুল তাহার মধ্য হইতে বাছিয়া লইয়া, পান্না তাহার বুকে গুঁজিল। তারপর দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, একটু দর্পিতভাবে বলিল—"আমাদের পাহাড়ের বুকে যেমন গন্ধভরা খুব লাল গুলাব জন্মায়, এমন আর কোথাও হয় না।"

এমন সময়ে কে একজন দ্বারের নিকট হইতে তাহার কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল—"সত্যই তাই পান্না বেগম!"

যে এ কথা বলিয়াছিল—সে সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া হাস্যবদনে বলিল—"হাজার তস্‌লীম! আমার কসুর মাফ্ হয়।"

পান্না; কৃত্রিম বিরক্তিপূর্ণ মুখে বলিল—"বড়ই বেয়াদব তুমি! হাজার কসুর তোমার! তাহার কোনটা আমি মাফ্ করিব আফ্‌শান? যাক্ খবর কি? এমন অসময়ে কেন?"

আফ্‌শান নিকটস্থ একটী আসনে বসিয়া, মুখখানা খুব গম্ভীর করিয়া বলিল—"খবর খুব জবর!!"

পান্না। তোমার গম্ভীর মুখ দেখিয়া আমার খুব সন্দেহ হইতেছে! ব্যাপার কি শুনি?

আফ্‌শান্। ব্যাপার বড় সাংঘাতিক! যে মোগল সেনাপতি আজ তোমার কৌশলে বন্দী হইয়াছে, আমাদের বাদশা

সর্দ্দারদের সহিত পরামর্শ করিয়া, তাঁহার প্রাণদণ্ডের হুকুম দিয়াছেন! কাল প্রভাতের পরই এই মোগলকে মাটীতে গর্ত্ত খুলিয়া জীবন্ত প্রোথিত করিতে হইবে।"

পান্না। কয়েদী কার জিম্মায় রহিল?

আফ্‌শান্। আমার!

পান্না কি ভাবিয়া বলিল—"ভালই হইয়াছে। তাহার উপর কোনরূপ নিষ্ঠুরতা করিও না। চব্বিশ ঘণ্টার কমও তাহার পরমায়ু! আহা! আমার বুদ্ধির দোষে বেচারার প্রাণটা গেল!"

আফ্‌শান্। যে আমাদের বাদশাহের শত্রু, আমাদের স্বাধীনতা নাশের প্রধান উদ্যোগী, যে গোপনে সেনা লইয়া আমাদের প্রাসাদ দখল করিতে আসিয়াছিল, আর তাহার সেই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে, যে আমাদের মহা সর্ব্বনাশ উপস্থিত করিত, তাহার উপর তোমার এত করুণা কেন পান্না?

পান্না বিস্মিতনেত্রে আফ্‌সানের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"তুমি কি ভাবিয়াছ আফ্‌শান! আমাদের এত বড় সাংঘাতিক শত্রু যে, তাহার উপর করুণা প্রকাশের অন্য কোন কারণ থাকিতে পারে? ছিঃ! তুমি বড়ই সন্দিগ্ধ চিত্ত।"

আফ্‌শান এ কথাটা বলিয়া ভাল কাজ করে নাই,। তখনই তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া একটু সপ্রতিভ ভাবে বলিল,— "একথা বলিবার অন্য উদ্দেশ্য আমার কিছুই নাই। যদি অনিচ্ছায় এ কথা বলিয়া তোমার মনে কোন কষ্ট দিয়া থাকি, আমায়

মাফ্ করিও তুমি। পান্না! তুমি আমার। এই যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে নিশ্চয়ই আমাদের বিবাহ হইবে! রহস্যচ্ছলে একটা কথা বলিলে তুমি প্রায়ই তাহার অন্য অর্থ করিয়া লও। এই তোমার দোষ।"

অপাঙ্গে বিদ্যুৎ খেলাইয়া, তাহার লাল ঠোঁট দুখানি, অভিমানের মৃদুতরঙ্গে ফুলাইয়া, পান্না বলিল—"আচ্ছা আফ্‌শান আলি! একদিন তোমার এই বিদ্রূপের শোধ লইব। তোমাকে খুব ভালবাসি কি না, তাই তুমি আমাকে এতটা উপেক্ষা কর!"

আফ্‌শান পান্নাকে সত্যসত্যই প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিত। পান্নার রং গোলাপের বর্ণকে লাঞ্ছিত করে। পান্নার কটাক্ষ, আকাশের বিদ্যুতের চেয়েও জ্বালাময়ী। পান্নার হাসি, যেন নব বসন্তের নূতন হিল্লোল মাখা। পান্নার কণ্ঠস্বর শুনিয়া কোয়েলা পাপিয়া লজ্জায় বনান্তরালে মুখ লুকায়। এমন যে সুন্দরী শ্রেষ্ঠা পান্নামতি, যে দুর্গাধিপের একমাত্র কন্যা—আর তাঁহার দেহান্তের পর, যে তাঁহার রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী, সে পান্নাকে আফ্‌শান ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে কি?

আফ্‌শান নতজানু হইয়া পান্নার সম্মুখে বসিয়া, সহাস্য-মুখে যুক্তকরে বলিল—"বান্দার গোস্তাখি মাফ্ হয়, বেগম সাহেবা! আর কখনও এমন অপরাধ করিব না।"

আফ্‌শানের ভাবগতিক দেখিয়া, পান্না হোঃ—হোঃ শব্দে হাসিয়া উঠিল। এ হাসিটা ঠিক বিদ্রূপের না প্রেমাস্পদের তোষামোদজনিত আনন্দের একটা অস্ফুট অভিব্যক্তি, আফ্‌শান

তাহা ঠিক্ বুঝিতে পারিল না। সে হতভম্বের মত, পান্নার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া বলিল—"কেন পান্না! তুমি সহসা হাসিয়া উঠিলে কেন?"

পান্না। হাসিলাম—তোমার কথা শুনিয়া। বাদশা কোথায় আমার, যে আমি বেগম হইব? আমার—যিনি বাদশা হইবেন তিনি ত এখন স্বপ্নরাজ্যে। বেগম হইলাম আমি কিরূপে?

আফ্‌শান বলিতে যাইতেছিল, আমিই তোমার সেই স্বপ্ন রাজ্যের বাদ্‌শা। কথাটা আফ্‌শানের ঠোঁটের আগায় আসিল বটে, কিন্তু তাহার সাহসে কুলাইল না, যে সে তার মনের কথাটা পান্নাকে খুলিয়া বলে।

এই আফ্‌শান, দুর্গাধিপতি মীরাণশার সেনাপতি। বাল্যকাল হইতে আফ্‌শান পিতৃমাতৃহীন। তাহার পিতা এক পার্ব্বত্য সর্দ্দার ছিলেন। মৃত্যুকালে, তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র রাজ্য, সমস্ত সম্পত্তি ও পুত্র আফ্‌শানকে পান্নার পিতার হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। পান্নার পিতাই তাহাকে এযাবৎ পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিয়া আসিতেছেন।

তাহারা আবাল্য একত্রে পালিত, খেলা ধূলার সঙ্গী। তারপর যৌবনের প্রারম্ভেও তাহাদের দেখা সাক্ষাতের ও অবাধভাবে মেশামিশি করিবার, কোন প্রতিবন্ধকই ছিল না। আফ্‌শান শক্তিশালী বীর। সেইই পান্নার অদ্ভুত তীরচালনা বিদ্যার শিক্ষা গুরু। এই সব কারণেই এই আফ্‌শান মনে মনে জানে আফ্‌জাই-সর্দ্দার মীরণশার বেতনভোগী সেনাপতি হইলেও

সে একদিন তাঁহার কন্যাকে পত্নীরূপে লাভ করিয়া, এই পার্ব্বত্য-রাজ্যের একাধিশ্বর হইবে।

আকাশে সহসা মেঘ উঠিলে, চাঁদের মুখ খানি যেমন মলিন হইয়া পড়ে, পান্নার মনে হঠাৎ কি একটা কথা জাগিয়া উঠায়, তাহার হাস্যপ্রফুল্ল মুখখানি, সহসা যেন সেইরূপ মলিনভাব ধারণ করিল। কিন্তু সে ভাবটা খুবই ক্ষণস্থায়ী। আর আফ্‌শান তাহা দেখিতে পাইল না।

সহসা কথার স্রোত অন্যদিকে ফিরাইয়া লইয়া পান্না বলিল, "আচ্ছা আফ্‌শান! আজকের এই মোগলবন্দী, কি উদ্দেশ্যে আমাদের পুরীর পিছনে আসিয়া লুকাইয়া ছিল, তাহার কিছু গূঢ় রহস্য জানিতে পারিলে কি?"

আফ্‌শান বলিল—"সে শয়তানের মনের কথা জানিতে কি আর আমাদের বাকী আছে পান্না? পঞ্চাশ জন সশস্ত্র সেনা তাহার সঙ্গে ছিল। সঙ্গী সেনাদের, নীচের উপত্যকার এক জঙ্গলের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে লুকাইয়া রাখিয়া, গভীর রাত্রে দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া তোমার পিতাকে বন্দী করাই, তাহার মনের অভিপ্রায়। সে জানে, কেবলমাত্র তোমার পিতাকে বন্দী করিতে পারিলে অতি সহজেই আকবরশার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। এই লোকটা এত চতুর, যে সেঁএ সন্ধানও রাখে, যে আমাদের সেনারা পুরীর মধ্যে থাকে না। বাহিরের এক ছাউনীতে থাকে। সেই বন্দী সৈনিকের পোষাক-পরিচ্ছদ ও চেহারায় বোধ হইল, সে একজন পদস্থ মোগল-সেনাপতি।

গোয়েন্দার মুখে আমি সংবাদ পাইলাম—এই পঞ্চাশ জন সেনা নীচের উপত্যকার এক গভীর জঙ্গলমধ্যে অবস্থান করিতেছে। আমি একশত পাঠান সেনা লইয়া তাহাদের চারিদিক বেষ্টন করি। মোগল পাঠানে সেখানে একটা ছোট খাট লড়াই হয়। অনেকেই পলাইয়া যায়,কেবল দশজনকে আমরা বন্দী করিয়াছি।”

পান্না সহাস্যমুখে বলিল—“এই জন্যই ত তোমায় এত ভালবাসি। উপস্থিত বিপদের সময় তোমার বুদ্ধি যেন নানা-দিকে প্রসারিত হইয়া পড়ে। সেবারেও দেখিয়াছিলাম, এবারেও দেখিতেছি। যাক্ প্রধান কয়েদীকে ভালরূপ হেফাজতে রাখিয়াছ ত? মোগলেরা বড়ই চতুর। সে কথা বোধ হয় তোমার জানা আছে।”

আফশান, তাহার বক্ষবসনের মধ্য হইতে একটী চাবি বাহির করিয়া পান্নাকে দেখাইয়া একটু দর্পের সহিত বলিল—“পাঠানও খুব ভালই জানে, তাহাদের চিরশত্রু অতি সতর্ক এই মোগলের সঙ্গে, কিরূপভাবে ব্যবহার করিতে হয়। মোগলবন্দীকে কিরূপে হুঁসিয়ারিতে হেফাজতে রাখিতে হয়। পান্না! তুমি নিশ্চিন্ত হও। কয়েদী যখন আমার জিম্মাতেই আছে, তখন তোমার কোন আশঙ্কাই নাই। কাল প্রভাতে তার ছিন্ন মুণ্ড তোমায় দেখাইব।”

পান্না বলিল—“নিয়তিকে যে কেহ কখনও অতিক্রম করিতে পারে না, তাহার প্রমাণ এই মোগল-সেনাপতি। তাহা না হইলে সে ওরূপ অবস্থায় আমার চোখেই বা পড়িবে কেন?

যাক্—রাত্রি অধিক হইয়াছে, আমি শয়ন করিগে। বড় ঘুম পাইতেছে আমার।"

পান্নাকে অভিবাদন করিয়া আফ্‌শান বিদায় লইতে উদ্যত, এমন সময়ে পান্না সহাস্যমুখে বলিল—"তুমি আমার হাতের তৈয়ারি সেরাজি মিশ্রিত সরবং খাইতে খুব ভালবাস—না আফ্‌শান! বিদায়ের পূর্ব্বে দুই চারি পাত্র সেরাজী পান করিয়া যাও। আজ কত পরীর সুখ স্বপ্ন দেখিবে!"

আফ্‌শান, পান্নার এই অযাচিত অনুগ্রহে, বড়ই আপ্যায়িত বোধ করিল। সে মনে মনে বুঝিল, পান্না নিশ্চয়ই তাহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসে। অবশ্য এরূপ অনুরোধ পান্না তাহাকে বহুবারই করিয়াছে। কিন্তু এবার যেন তাহাতে একটু অতিরিক্ত আদর মাখানো।

আফ্‌শান পান্নার সাদর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া এক সোফায় বসিল। পান্না সহাস্যমুখে বলিল "একটু অপেক্ষা কর! আমি পাশের ঘর হইতে তোমার জন্য সরবং ও সেরাজি আনিতেছি।"

পান্নার খাস বাঁদি আট দশ জন। তাহাদের একজনকে হুকুম করিলেই, তখনি তাহা তামিল হইত। কিন্তু পান্নার রূপমোহে উন্মত্ত আফশান ভাবিল, পান্না যে স্বহস্তে সরবং প্রস্তুত করিতে গেল, সেটা তাহার উপর আন্তরিক অনুরাগের অতিরিক্ত পরিচয়।

পান্না, সরবং মিশ্রিত সেরাজি পাত্র, ও কয়েক প্রকার

সুমিষ্ট পিষ্টক আনিয়া, আফশানের সম্মুখে রাখিয়া তাহাকে একটু বেশী খাতির দেখাইবার জন্য, এক স্বর্ণময় ক্ষুদ্র পানপাত্রে নিজের হাতে মদিরা ঢালিয়া দিল।

এই আপ্যায়নে, আফ্‌শান একটুমাত্র আশ্চর্য্য বোধ করিল না। সে মনে মনে ভাবিল—"পান্না আমার প্রভু কন্যা হইলেও আমায় যথেষ্ট ভালবাসে। তাহার পিতার প্রধান সেনাপতি ও বন্ধুপুত্র আমি। আফ্‌জাই রাজ্যের সেনা চালনার ভার এখন আমারই উপর ন্যস্ত। গতবারে আমিই তো কৌশলজাল সৃষ্টি করিয়া, এই দুষমন্ মোগলকে ধূলাপায়েই বিদায় করিয়াছিলাম। পান্না এসব জানিয়া শুনিয়াও যে আমায় এতদিন বিবাহ করে নাই—ইহাই তাজ্জব কথা। আমায় এই ভাবে খাতির করিতে ত সে চিরদিনই বাধ্য।"

পান্না-মতি আফ্‌শানকে চিন্তা নিমগ্ন দেখিয়া, সুরাপাত্র তাহার সম্মুখে ধরিয়া বলিল—"কি ভাবিতেছ আফ্‌শান?"

আফ্‌শান সেই পানপাত্র মূহুর্ত্ত মধ্যে নিঃশেষ করিয়া বলিল—"ভাবিতেছি আর কি? আমার একমাত্র চিন্তার বিষয় এখন তুমি। আর তোমার ঐ বিশ্ব-বিমোহন রূপ! জানি না, বিধাতার সৃষ্ট ঐ অপূর্ব্ব রূপরাশি উপভোগের ভাগ্য, কোন ভাগ্যবানের অদৃষ্টে আছে?"

আফ্‌শানের পাশে বসিয়া পান্না তাহার হাত দুখানি মৃদুভাবে নিপীড়িত করিয়া বলিল—"তাহার উত্তরও কি আমায় দিতে হইবে আফ্‌শান? তোমার মন কি তোমায় বলিয়া

দেয় না—তোমার চোখ্ কি তোমায় দেখাইয়া দেয় না—যে আফ্জাই দুর্গাধিপনন্দিনী এই পান্নামতি, ভবিষ্যতে কার কণ্ঠশোভন করিবে ?”

সুরমারঞ্জিত বিশাল নয়নে, একটী কটাক্ষ হানিয়া, বান্ধুলি-কুসুমরাগলাঞ্ছিত ওষ্ঠাধরে একটু মৃদু হাসির তরঙ্গ তুলিয়া, পান্না আবার স্বর্ণভৃঙ্গার হইতে সেরাজি ঢালিল। পূর্ণপাত্রে টলটলায়-মান মদিরারস, উজ্জল আলোকের প্রতিচ্ছটায়, আর সেই পরমা-সুন্দরী পান্নার হস্তস্পর্শে, বড়ই সুন্দর দেখাইতে লাগিল।

পান্না—সুরাপাত্র আবার পূর্ণ করিয়া বলিল—“এই নাও আফ্শান ?”

আফ্শান বলিল—“কই তুমি খাইলে না ?”

পান্না। পরে খাইব। আগে তুমি না আমি! ছিঃ! দুষ্টামি করিও না। কবি হাফেজ্ বলিয়াছেন—“সুন্দরীর প্রদত্ত সুরা যে উপেক্ষা করে, সে অতি বর্ব্বর!”

আফ্শান সহাস্যবদনে বলিল—“আর কবি সাদি বলিয়াছেন, যে বর্ব্বর, সুন্দরীর প্রসাদিত সুরা ভিন্ন অপর সুরা স্পর্শ করে, সে শয়তানের ক্রীতদাস হয়।”

পান্না বলিল—“এ সব বিবাদ ও সব কাব্য-কবিতার কথা এখন চাপা দিয়া রাখ। আমি তোমার আদরিণী পান্নারাণী। আমি তোমায় হুকুম করিতেছি, এই দ্বিতীয় পাত্র সুরা তোমায় গ্রহণ করিতেই হইবে! করিবে কি না ?”

এই কথা বলিয়া, পান্না কৃত্রিম ক্রোধের সহিত তাহার ঠোঁট

দুখানি ফুলাইয়া, পরিকল্পিত মানভরে একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

মুগ্ধ আফ্‌শান বলিল—"না—না তুমি রাগ করিও না পান্না! আমি তোমার গোলামের গোলাম। আমায় হাসিমুখে যাহা আদেশ করিবে, তাহাই আমি পালন করিব।"

পান্না এবার হাস্যমুখে আফ্‌শানের পাশে বসিয়া বলিল—"তা না হ'লে আর ভালবাসা! সত্যই আফ্‌শান! তোষামোদ করিতেছি না তোমার! কি করিয়া নারীকে ভালবাসিতে হয়, তোমার মত পুরুষই তাহা ভালরূপ জানে। আর ছার নারী জন্ম আমাদের! আমরা কেবল রূপের গরবে, আর অভিমানের অহঙ্কারেই ফুলিয়া মরি।"

এভাবের কথা আফ্‌শান পান্নার মুখে আর কখনও শোনে নাই। নৈশসমীরণবাহিত উদ্যানকুসুমের সুবাস, কক্ষমধ্যস্থ লোবানের উগ্রমধুর গন্ধ, পান্নার সাঁচ্চাখচিত ফিরোজা রংএর ওড়নায় সংলিপ্ত মৃগমদবাস, সেরাজির নেশার সঙ্গে মিশিয়া, পান্নার এই সোহাগের কথাগুলি যেন তাহাকে মস্‌গুল্ করিয়া তুলিল। এত গুলি সোহাগের কথা যেন তাহার মগজে মহাবিপ্লব উপস্থিত করিয়া দিল।

সেই দুই পাত্র মাত্র সেরাজি পানের পরই, আফ্‌শানের নেশাটা যেন একটু বেশী গোছের হইয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু তাহাহইলে কি হয়, স্বপ্নালসময় নেশার চক্ষে, সে দিন সে যেন পান্নাকে বেহেস্তের পরমা রূপসী মনে করিল। সে ভাবিল,

নিত্য যে পান্নাকে প্রেমালসিত নেত্রে সে দেখিয়া থাকে, সে ত এ পান্না নয়! এত নিখুঁত—এত ভুবনভরা সৌন্দর্য্য আজ এই পান্নার মুখে, চোখে, চাহনিতে, অঙ্গে, উরসে, প্রকোষ্ঠে ও সর্ব্বদেহে! সে একদৃষ্টে, বিহ্বলভাবে পান্নার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

পান্না বুঝিল—ঔষধ ধরিয়াছে। সে ক্ষিপ্রগতিতে আবার সুরাপাত্র পরিপূর্ণ করিয়া, আফ্‌শানের সম্মুখে ধরিল। অর্দ্ধ সচেতন, মন্ত্রমুগ্ধ জীবের ন্যায়, পান্নার ইচ্ছাশক্তির অধীন হইয়া, আফ্‌শান পুনরায় তৃতীয় পাত্র সুরা উদরস্থ করিল।

পান্না সাদরে আফ্‌শানের হাতখানি ধরিয়া বলিল—"এক দৃষ্টে আমার মুখের দিকে চাহিয়া কি দেখিতেছ আফ্‌শান? আজ তোমার এ ভাব পরিবর্ত্তন কেন? আজ তোমার এ নূতন মোহ কেন?"

আফ্‌শান মৃদুহাস্যের সহিত বলিল—"কেন তা জানি না। তবে, তোমার ঐ ভুবনমোহন সৌন্দর্য্য এতদিন যে চোখে দেখিয়া আসিতেছি, সে চক্ষুর দৃষ্টি যেন কি একরকম একটা কুহেলিকা আচ্ছন্ন ছিল। আজ যেন সে কুহেলিকা সরিয়া গিয়াছে। আজ যেন তাহাতে নূতন দৃষ্টিশক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেখিতেছি, যেন বেহেস্তের এক জ্বালাময়ী হুরী আসিয়া, আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, স্বর্ণপাত্রে ভরিয়া তীব্র মোহময় মদিরা দিতেছে। আজ যেন কি একটা অপূর্ব্ব মধুরতায় দিকদিগন্ত পূরিয়া উঠিতেছে। আজ তোমার দৃষ্টি মধুর, আস্য মধুর, হাস্য মধুর, তোমার নীল ওড়না যেন মেঘের মত, তোমার মুখ যেন মেঘ ঢাকা চাঁদের মত।

সুনীল সূক্ষ্ম ওড়নায় তোমায় ঐ বরবপু আচ্ছাদিত। কিন্তু বোধ হইতেছে, যেন বিদ্যুতের দীপ্তি আবরিত করিবার জন্য, একখানা নীল মেঘ তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। তোমার রক্তোৎপল-লাঞ্ছিত গণ্ডে, কি একটা অপূর্ব্ব মধুরিমা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তোমার বাহুপ্রকোষ্ঠশোভিত রত্নালঙ্কারসমূহে দীপালোকের জ্যোতিঃ পড়ায়, তাহা যেন সন্ধ্যার তারার মত উজ্জলভাব ধারণ করিয়াছে। এত সুন্দর, এত মধুর, এত স্বপ্নময়, এত কুহেলিকাময় তুমি? এস পান্নামতি! এস আমার জীবনের জীবন! আমার কাছে আসিয়া বসো। আমার বুকের ভিতর কেমন করিতেছে। তুমি আমার বুকে একটু হাত বুলাইয়া দাও। এ জ্বালাময় প্রাণ শান্তিলাভ করুক।"

পান্না একটা গভীর উদ্দেশ্য হৃদয়ে পোষণ করিয়াই, আজ এই ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি ধরিয়াছিল। সে আবার একটি সম্মোহন কটাক্ষ বাণ ছাড়িয়া, মদিরাপাত্র পূর্ণ করিয়া বলিল—"সেরাজীটা নূতন আমদানী। সম্প্রতি ইস্পাহান হইতে আসিয়াছে। এজন্য বোধ হয়, তোমার নেশা বোধ হইতেছে। এবার গুলাব মিশাইয়া দিতেছি। এই টুকু পান কর। যে কষ্টটা হইতেছে তাহা আর থাকিবে না।"

পান্না গুলাবাধার হইতে স্বল্প পরিমাণে গুলাববারি ঢালিয়া সেই সেরাজির সহিত মিশাইয়া দিল। আফ্‌শান আবার এক পাত্র পান করিল।

এই গুলাব-মিশ্রিত সেরাজি পানের পর হইতেই, আফ্‌শানের

ভয়ানক নিদ্রাবেশ হইল। সে আর বসিয়া থাকিতে না পারিয়া শয্যায় ঢলিয়া পড়িল।

আফ্‌শানকে মোহ নিদ্রাচ্ছন্ন দেখিয়া, পান্না প্রসন্নমুখে বাতায়নপথে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহারও প্রাণের ভিতর এতক্ষণ ধরিয়া কি একটা ভারি বোঝা চাপিয়া, তাহাকে বড়ই কষ্ট দিতেছিল। নিস্তব্ধ, স্নিগ্ধসমীরপ্রবাহ পূর্ণ প্রকৃতির বুকে সে একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"খোদা! মেহেরবান্! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। আজ আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে যেন কোন বাধা বিঘ্ন উপস্থিত না হয়।

পান্না ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, আফ্‌শান এক শোফার উপর পড়িয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। কাছে দাঁড়াইয়া বহুক্ষণ নির্নিমেষনেত্রে তাহার নিশ্বাসপ্রশ্বাসের গতি লক্ষ্য করিয়া, পান্না অস্ফুটস্বরে বলিল—"রজনীর মধ্যভাগ উত্তীর্ণ। আর ছয় ঘণ্টা পরেই প্রভাত আসিবে। এরই মধ্যে আমার সকল কাজ শেষ হওয়া চাই।"

অতি ধীরে ধীরে, অতি সতর্কভাবে, আফ্‌শানের আচ্‌কানের মধ্যে অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া পান্না অতি মৃদু ভাবে অতি সন্তর্পণে, তাহার আচকানের ভিতর হইতে কারাগারের চাবিটি বাহির করিয়া লইল। উত্তমরূপে চাবিটী পরীক্ষা করিয়া, চারিদিকে চকিতনেত্রে সভয়ে চাহিয়া, আবার সেই চাবিটী আফ্‌শানের জামার জেবের মধ্যে রাখিবার

জন্য হস্ত প্রসারণ করিল। তাহার পরক্ষণেই চকিতহৃদয়ে আবার হাত গুটাইয়া লইল।

চাবিটী হাতে করিয়া লইয়া, সে আফ্‌শানের অধিকৃত সোফার নিকট হইতে একটু দূরে আসিয়া দাঁড়াইল। কক্ষ মধ্যে তখনও সুগন্ধ দীপগুলি, স্ফটিক দীপাধারে উজ্জ্বল আলো বিকীরণ করিয়া, কখনও কম্পিত কখনও স্থিরভাবে জ্বলিতেছে।

চাবিটী এইভাবে হস্তগত করিবার পর হইতেই, পান্নার হৃদয়ে একটা নূতনতর চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। কি যেন একটা ভয়, একটা সন্দেহ, একটা বিভীষিকাময় ভবিষ্যৎ তাহার প্রাণ-টাকে বড়ই নিপীড়িত করিতে লাগিল। পান্না, সভয়ে তাহার হাত দুটি দিয়া তাহার বুক খানি চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"মেরে মেহেরবান্ খোদা! আজকের রাত্রিটার জন্য আমার হৃদয়ে একটু বল দাও। প্রাণে শক্তি দাও। তারপর—তারপর, যা কিছু কষ্ট দুঃখ যন্ত্রণা আমায় দিবে, তাহার জন্য কোন অনুযোগ করিব না প্রভু!"

মুন্নাকে সে অন্যদিন কাছে লইয়া শোয়। কিন্তু আজ তাহাকে পাশের কক্ষে অপেক্ষা করিতে আদেশ করিয়াছিল। সুতরাং মুন্না তখনও বিনিদ্রনেত্রে তাহার সখীর পুনরাগমন প্রত্যাশায়, স্থিরভাবে তথায় অবস্থান করিতেছিল। কি উদ্দেশ্য চালিত হইয়া পান্না তাহার সম্বন্ধে এরূপ ব্যবস্থা করিল, তাহারও কিছু কিছু আভাস মুন্না পূর্ব্বে পাইয়াছিল। কিন্তু সে বড়ই সতর্ক, অথচ কৌতুহলস্পৃহাশূন্য। কাজেই চুপ করিয়া ছিল।

চাবিটী হস্তগত করিয়া, পান্না মুন্নার কক্ষ দ্বারে মৃদু করাঘাত করিয়া ডাকিল—"মুনিয়া ! মুন্না !"

মুনিয়া তখনই দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—"খবর কি সাহেবা ?"

পান্না। ঔষধ ধরিয়াছে। আলি আফ্‌শান অঘোরে ঘুমাইতেছে। কারাকক্ষের চাবিও আমার হস্তগত।

মুন্না। সব কথা খুলিয়া বল দেখি এবারে। কারাগারের চাবিতে তোমার কি প্রয়োজন ?

পান্না। আমি সেই মোগল বন্দীকে মুক্তিদান করিব !

মুন্না। বল কি বিবি ? না—না, অমন সর্ব্বনেশে কাজ করিও না।

পান্না। কিছুই অন্যায় কাজ ত করিতেছি না। আমি তাহাকে ধরাইয়া দিয়াছি বা চেষ্টা করিয়া ধরিয়াছি। সুতরাং আমিই মুক্তি দিব। আমার বিবেকই আমাকে এ কার্য্য করিতে বলিতেছে।

মুন্না। কিন্তু কারাগারের দ্বারে যে আরও দুই জন প্রহরী আছে !

পান্না। হিম্মত খাঁ তাহাদের মধ্যে একজনকে মাদক দিয়া অজ্ঞান করিবে। আর এক জন যে—সে হিম্মতের খুব অনুগত। তাহাকে হস্তগত করিতে বেশী কষ্ট হইবে না। হিম্মত তাহাকে গড়িয়া রাখিয়াছে।

মুন্না। তা না হয় হইল। বন্দীকে মুক্ত করিয়া দিলে

সবই করিলে। কিন্তু এর পরিণামে আফ্‌শানের মৃত্যু যে অনিবার্য্য। তুমি কি মনে করিয়াছ, আফ্‌শান এসকল কথা প্রকাশ করিবে না ?

পান্না। না সে আমার বিরুদ্ধে কোন কথাই বলিবে না। সে আমায় খুব ভালবাসে।

মুন্না একটু শ্লেষপূর্ণ স্বরে বলিল—"আর তাহার প্রাণদণ্ড করাইয়া তুমি তাহাকে তাহার ভালবাসার প্রতিদান দিতেছ! বেশ যাই হোক্।"

পান্না সদর্পে গ্রীবাভঙ্গি করিয়া বলিল—"তুই ভুল বুঝিয়াছিস্ মুন্না! কার সাধ্য পান্নার দেহে প্রাণ থাকিতে আফ্‌শানের দেহ হইতে তাহার জান্ কাড়িয়া লইতে পারে ?

মুন্না কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া বলিল—"দেখিতেছি, চারিদিক হইতেই নূতন বিপদ জাল বেষ্টন করিতেছে। এ জালের বুনন তোমার নিজের হাতের। জানি না কি উপায়ে তুমি এইসব ইচ্ছাসৃজিত আগন্তুক বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবে ?

পান্না কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিয়া বলিল—"মুন্না! ইহকাল ত দুদিনের খেলা। জীবন থাকাই আশ্চর্য্য। যাওয়াটা বেশী তাজ্জব নয়। আমি ত নিজের ইচ্ছায় কিছুই করিতেছি না। ঐ মহিমাময় বিধাতা আমায় যে পথে চালাইতেছেন, আমি সেই পথেই চলিতেছি। বিপদ তাঁহারই প্রেরিত, আর বিপদ মুক্তির ভারও তাঁহার হাতে। এর পর অবসর পাই, এ কথা তোকে খুব ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিব। আজ আর নয়।"

এই কথা বলিয়া পান্না তাহার বক্ষ বসনের মধ্য হইতে একটী বংশী বাহির করিয়া, তাহাতে মৃদু ফুৎকার দিল। পর মুহূর্ত্তেই, এক বস্ত্রাবৃত ছায়ামূর্ত্তি সেই কক্ষের বারান্দায় দেখা দিল। কক্ষ দ্বার উন্মুক্ত।

সেই মূর্ত্তি সন্নিকটস্থ হইলে পান্না তাহার কাণের কাছে গিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"আফ্‌শানের মোহসমাচ্ছন্ন দেহ এখনি হাওয়া-বারান্দায় রাখিয়া এসো। তারপর তোমার অনেক কাজ আমার সঙ্গে। মরিবার সময় তোমারই কোলে মা আমাকে তুলিয়া দিয়াছিলেন, একথা তোমার মুখেই বহুবার শুনিয়াছি। তুমি আমাকে কন্যাবৎ প্রতিপালন করিয়াছ। আজ যাহা করিতে অগ্রসর হইতেছি, তাহা অতি বিপদজনক। যাক্—এ দিকের সব ঠিক্ ত হিম্মত?

সেই আগন্তুক নতজানু হইয়া বসিয়া, পান্নার বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বন করিয়া বলিল—"সবই ঠিক। সে জন্য তুমি নিশ্চিন্ত থাক মা।"

হিম্মত তখনই বারান্দার শেষভাগে চলিয়া গিয়া আর একজন বিশ্বাসী বান্দাকে ডাকিয়া পান্নার কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। তারপর আফ্‌শানের নিদ্রালসদেহ দুইজনে কাঁধে করিয়া, সেই প্রাসাদের তৃতীয়তলের হাওয়াবারান্দার মধ্যে এক মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত বেদীর উপর রক্ষা করিল।

ফিরিয়া আসিয়া হিম্মত, পান্নাকে বলিল—"তোমার দ্বিতীয় আদেশ কি মা?"

পান্না। সেই দুইজন প্রহরীর সম্বন্ধে যেরূপ বন্দোবস্ত করিবে বলিয়াছ, তাহা ঠিক হইয়া গিয়াছে ত ?

হিম্মত। নিশ্চয়ই জননী ! হিম্মত জীবনে কখনও তোমার কাছে মিথ্যা কথা বলে নাই। একজনকে খুব কড়া ভাঙ্গের সরবৎ দিয়া অজ্ঞান করিয়াছি। আর একজনের মুখ, তোমার স্বর্ণমুদ্রা পূর্ণ থলিয়াটী পাইলেই বন্ধ হইবে। আর বিলম্ব করিও না। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে। হয়তো এখনি ঝড় উঠিবে। বৃষ্টি আসিবে।

পান্না তখনই বাতায়নপথ দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল আকাশ সত্যসত্যই খুব মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে। একটু জোর হাওয়াও বহিতেছে। বৃষ্টি আসিল বলিয়া।

পান্না তাহার হস্তস্থিত স্বর্ণমুদ্রা পূর্ণ থলিয়াটী, হিম্মতের হাতে দিয়া বলিল—"তুমি কারাকক্ষের পথ পরিষ্কার করিয়া রাখ। আমি অল্পক্ষণ পরেই সেখানে যাইতেছি।"

হিম্মত বিনাপ্রশ্নে পান্নার আদেশ পালনে চিরদিনই অভ্যস্ত। যদিও সে অতি শিশুকাল হইতে এই পান্নাকে কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছে, তাহাহইলেও সে জানিত—যে তাহার হাতে ও কোলে মানুষ হইয়াছে, সেই পান্নামতি একদিন দুর্গাধিশ্বরী হইবে। সুতরাং সে পান্নাকে চিরদিনই স্নেহমিশ্রিত একটা সম্মান প্রদর্শন করিত। বলা বাহুল্য, বৃদ্ধ হিম্মত খাঁ তখনই পান্নার আদেশমত কার্য্য করিতে চলিয়া গেল।

নিম্নশ্রেণীর অপরাধীদের জন্য দুর্গমধ্যে একটী অপরিচ্ছন্ন

কারাগার থাকিলেও, দুর্গাধিপতি মীরণশাহ, তাঁহার প্রাসাদ মধ্যস্থ একটী পাষাণময় কক্ষে, এই মোগল-বন্দীকে আবদ্ধ রখিয়াছিলেন। সাধারণ কারাকক্ষ অপেক্ষা, এই কক্ষের অবস্থা খুব ভাল। আর চব্বিশটী ঘণ্টা যার পরমায়ুর পরিমাণ, তাহার অবশিষ্টপ্রায় জীবনের জন্য যতটা সুবিধাকর বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে, তিনি তৎসম্বন্ধে কোন ত্রুটিই করেন নাই। এইজন্যই সাধারণ প্রহরীর হস্তে বন্দীর রক্ষার ভার না দিয়া, তিনি তাঁহার সুচতুর সেনাপতি আফ্‌শান খাঁকে; এই মোগল কয়েদীর রক্ষার ভার দিয়াছিলেন।

দুইটী কারণে, প্রাচীন দুর্গাধিপতি মীরণশাহ এই মোগল বন্দীর প্রতি একটু করুণার ভাব দেখাইয়াছিলেন। তাহার তাহার প্রথম কারণ, এই বন্দীর মুখশ্রী দেখিয়া তাহার মনে কেমন একটা ধারণা জন্মিয়াছিল, এই বন্দী মোগল—সাধারণ শ্রেণীর সেনাপতি নহেন। নিশ্চয় ইনি কোন সম্ভ্রান্তকুল সম্ভূত।

তারপর এই বন্দীর বিচার হইয়াছিল, তাঁহার গুপ্ত দরবারে। এই দরবারে তাঁহার রাজ্যের প্রধান প্রধান পাঁচজন সামন্ত বা সর্দ্দার, বিচারকরূপে উপবেশন করিয়াছিলেন। মীরণশাহ বন্দীকে সামান্যরূপ শাস্তি দিয়া ছাড়িয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু সর্দ্দারেরা তাহাতে সম্মত হন নাই। তাঁহারা একমত হইয়া বন্দীর প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন। সর্দ্দারগণ যখন সকলেই একমত, ইচ্ছা না থাকিলেও মীরণশাহ বাধ্য হইয়া তাহাদের প্রস্তাবে অগত্যা সম্মতিদান করেন।

কিন্তু এই সময়ে তাঁহার মনে, পান্নার প্রদর্শিত সেই বহুমূল্য অঙ্গুরীয়ের কথাটা সহসা উদিত হয়। মীরণশার মনে এক এক সময় এমন একটা সন্দেহের ছায়া বিকাশ হইতে লাগিল, যে এই বন্দীই হয়ত শাহজাদা দানিয়েল। তিনি মনে জানিতেন আকবরশাহের পুত্র দানিয়েলকে হত্যা করিলে, এই আক্জাই দুর্গ অতি শীঘ্রই সমভূমি হইবে।

তারপর তিনি ভাবিলেন ধরিতে গেলে পান্নার চেষ্টাতেই ত এই সেনাপতি বন্দী হইয়াছে। যদি যথার্থই সে শাহজাদা হইত, তাহাহইলে পান্না পূর্ব্ব হইতেই তাহার পিতাকে সাবধান করিয়া দিত। কিন্তু তাহা সে যখন করে নাই, তখন এ কখনই শাহজাদা দানিয়েল নয়।

আবার পরক্ষণেই তাঁহার মনে আর একটা কথা জাগিয়া উঠিল, যে সম্রাট আকবরের পুত্র কখনই এতদূর নির্ব্বোধ হইতে পারেন না, যে একাকী শত্রুপুরী মধ্যে গুপ্তচরের মত প্রবেশ করিবেন। প্রকৃত উন্মাদ না হইলে, এরূপ বিপদজনক কাজে কেহ কখন অগ্রসর হইতে পারে না।

তাহা ছাড়া মীরণশাহ মনে মনে আর একটা আশা পোষণ করিতেছিলেন। এই বন্দীকে তাহার পরিচয় ও পদবী সম্বন্ধে অনেকবার প্রশ্ন করা হইয়াছিল। কিন্তু সে তাহার কোনটীরই উত্তর দেয় নাই। সর্দ্দারেরা একথাও বলিয়াছিলেন, যে অপরাধীর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বে, তাহাকে আরও দুই চারিটী কথা জিজ্ঞাসা করা হইবে। মীরণ-শা মনে

ভাবিয়াছিলেন, পরদিন প্রভাতের প্রথম প্রহর অতীত না হইলে এই অপরাধীর প্রাণদণ্ড হইবে না। ইহাই আফ্‌জাই-রাজ্যের বিধান। এই বন্দী প্রকৃতই যদি সুলতান দানিয়েল হন, আর তিনি তাঁহার জীবনের শেষমুহূর্ত্তে আত্মপরিচয় প্রকাশ করিয়া ফেলেন, তাহাহইলে ঘটনাস্রোত হয়ত অন্যদিকে ফিরিয়া দাঁড়াইতে পারে। প্রতিহিংসা পরায়ণ এই সর্দ্দারেরা কখনই আকবর শাহের পুত্রের প্রাণদণ্ড করিতে সাহসী হইবে না।

আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যুবরাজের সঙ্গী দ্বাদশ জন সৈনিক যাহারা আফ্‌গানের হস্তে বন্দী হইয়াছিল, বহু নির্য্যাতনে, তাহারাও কোন গূহ্য কথা ব্যক্ত করে নাই।

তাঁহার শয়ন কক্ষে যাইবার সময়, মীরণশা প্রতি রাত্রে তাঁহার কন্যার সহিত একবার দেখা করিয়া যান। এই সব কারণে মনের অবস্থা খারাপ থাকায়, সন্ধ্যার পরই তিনি পান্নার নিকট তাঁহার অনুপস্থিত হইবার কথা বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাহা না হইলে, পান্না তাহার ইপ্সিত কার্য্যসাধনের এতটা সুযোগ ও অবসর পাইত কি না সন্দেহ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দুর্গমধ্যস্থ পূর্ব্বোক্ত প্রস্তরময় নির্জ্জন কক্ষে, সেই মোগলবন্দী কি করিতেছেন, তাহা একবার আমাদের দেখিতে হইবে।

এক খানি নেয়ারের খাটিয়ার উপর শুভ্র শয্যা। বন্দী এই শয্যায় উপর বসিয়া কত কি ভাবিতেছেন।

তাঁহার সম্মুখে খাদ্য পরিপূর্ণ পাত্র। সে খাদ্য অবশ্য কয়েদীর নিকৃষ্ট খোরাক নহে। পোলাও ও মাংসের বিবিধ রসনাতৃপ্তিকর উপকরণ। মিষ্ট পিষ্টক ও সুবাসিত পানীয়। কিন্তু তাহার তিল মাত্র তিনি স্পর্শ করেন নাই। ভয়—যদি শত্রু সেই খাদ্য এবং পানীয়মধ্যে বিষ মিশাইয়া দিয়া থাকে।

এমন সময়ে আকাশে চিকুর হানিল। সেই বন্দী আশাপূর্ণ দৃষ্টিতে কক্ষের অতি উচ্চ স্থানে অবস্থিত. এক জানালার দিকে একবার চাহিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মৃদু মেঘগর্জ্জন ও বাতাসের সন্‌সনানি তাঁহার কর্ণগোচর হইল। এ সব দৈবপ্রেরিত ঘটনা দেখিয়া তাঁহার দুশ্চিন্তাকাতর মুখে আশার আলোক দেখা দিল।

বন্দীভুত মোগল সেনাপতি. তাঁহার শয্যার উপর উঠিয়া দাড়াইলেন। এ অবস্থায়, বাতায়নের মধ্যপথ পর্য্যন্ত তাঁহার চক্ষু পৌছিল। তিনি উপাধান দুইটী একত্র করিয়া আরও একটু উঁচু হইয়া দেখিলেন, চারি, দিকে সুচীভেদ্য অন্ধকার। তার মধ্যে চিকুর জ্যোতি। তৎসঙ্গে বাতাসের সন্‌সন্ শব্দ ও ধারা বর্ষণ।

মলিন হাস্যপূর্ণমুখে অস্ফুটস্বরে তিনি বলিলেন, "এই ত পলায়নের উপযুক্ত সময়। খোদা আমার সহায়। ঐ ক্ষুদ্র জানালার গরাদে দুইটা ভাঙ্গা কি অতি কষ্টকর হইবে? না—না, অতি হীন অপরাধীর মত কখনই আত্মরক্ষার চেষ্টা করিব না। আকবর শাহের পুত্র হইয়া, কখনই এরূপ হীনতা স্বীকার করিতে পারিব না।

পাঠক! এইবার বোধ হয় বুঝিয়াছেন, মীরানশার বন্দী এই মোগল সেনাপতি কে? ঠিক এই সময়ে, সেই কারাকক্ষের চাবির কল কে যেন অতি সন্তর্পণে ঘুরাইল।

শাহজাদা, চমকিয়া একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। ভাবিলেন এত রাত্রে কে এ কক্ষের চাবি খুলিতেছে? গুপ্ত হত্যাকারী! হইতেও পারে! নিষ্ঠুর পাঠানের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নাই। আমার নির্ব্বুদ্ধিতার পূর্ণ প্রায়শ্চিত্তের সময় আসিয়াছে। একখানি ছুরিকা পর্য্যন্ত নাই, যে এ সময়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করি।

কারাকক্ষের দ্বার খুলিয়া, সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ বোরখায় আবৃত এক ছায়ামূর্ত্তি অতিধীরে সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল!

শাহজাদা বলিলেন—"কে তুমি? গুপ্ত-ঘাতক! আমাকে হত্যা করিতে আসিয়াছ?"

যে আসিয়াছিল, সে কোন কথা কহিল না! স্থির হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। তার মুখমণ্ডলও কৃষ্ণবসনাবৃত।

শাহজাদা পুনরায় বলিলেন,—"স্বচ্ছন্দে তুমি তোমার কার্য্য শেষ করিয়া চলিয়া যাইতে পার! কোন বাধাই আমি তোমাকে দিব না। আমি নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার দোষে যে পাপ করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্তে বাধা দিবার কোন শক্তিই আমার নাই।

তখন সেই আগন্তুক, ক্ষিপ্রহস্তে তাহার মুখের আবরণটী খুলিয়া, দানিয়েলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কারাকক্ষ মধ্যে একটী দীপ জ্বলিতেছিল বটে, কিন্তু ততটা উজ্জ্বলভাবে নয়। কতকটা যেন আলো আঁধারের মিশ্রভাব।

শাহাজাদা সবিস্ময়ে বলিলেন—"কে তুমি ? কে তুমি ?"

তাহার অঙ্গের কৃষ্ণবর্ণের বোর্খাটা খুলিয়া ফেলিয়া, দীপা-লোকের সন্নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া সেই যুবতী বলিল—"আমায় চিনিতে পারিতেছেন না শাহজাদা ?"

বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে, শাহাজাদা সে মুখের দিকে বারেক-মাত্র দৃষ্টিক্ষেপ করিবামাত্রই, সেই রমণীমূর্ত্তিকে চিনিতে পারিয়া বিস্মিতভাবে বলিলেন—"একি পান্না ! তুমি ! তুমি কি আমায় হত্যা করিতে আসিয়াছ ? এস পান্না ! আমি বক্ষ পাতিয়া দিতেছি। তোমার কৌশলে আজ আমি বন্দী। তুমি পাঠানের প্রতিহিংসা যজ্ঞে পুর্ণাহুতি দিবার জন্য অগ্রসর হও। কোন বাধাই আমি দিব না।"

পান্না বলিল—"বেশী কথা বলিবার সময় নাই শাহজাদা ! আপনার সম্বন্ধে আমার নিজের পাপ যে কি তাহা বুঝিয়াছি ; আর তাহার প্রায়শ্চিত্ত কি তাহাও জানিয়াছি। আমার অতিরিক্ত অসহিষ্ণুতার জন্যই আপনি বন্দী হইয়াছেন। এজন্য আমি আপনাকে মুক্তি দিতে আসিয়াছি।

শাহজাদা। না তোমার দোষ কিছুই নাই। শত্রুর প্রতি প্রতিহিংসা লওয়া ত সকলেরই পক্ষে স্বাভাবিক। বিশেষতঃ পাষাণবক্ষে প্রতিপালিত—পাঠানের।

পান্না। সত্য বটে। কিন্তু আমি আপনাকে অতি হৃদয়-হীনার মত প্রলোভিত করিয়া, আমাদের দুর্গপ্রবেশের সমূহ বিপদজনক পথটা বলিয়া দিয়াছি। আমার ছলনায় পড়িয়া

এখানে না আসিলে আপনি আজ হয়ত এ ভাবে বন্দী হইতেন না! আপনার মনে পড়ে কি শাহাজাদা! সেই উন্মাদিনী পাহাড়ী যুবতীর কথা?

শাহজাদা। তার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি?

পান্না। আমিই এক পাহাড়িয়া যুবতীর ছদ্মবেশে আপনার শিবিরকক্ষে গিয়াছিলাম।

শাহজাদা। তুমি! পান্না মতি! দুর্গাধিপের কন্যা?"

পান্না। হাঁ আমি। প্রমাণ দেখিতে চান্ জনাব?

এই কথা বলিয়া পান্না তখনই তাহার বক্ষবসন মধ্য হইতে একটী অঙ্গুরীয় বাহির করিয়া বলিল—"বলুন দেখি জনাব! এ অঙ্গুরীয় কার?"

শাহজাদা সেই অঙ্গুরীয়ক দেখিবামাত্রই চিনিতে পারিলেন। তিনিই সে দিন রাত্রে, সেই ক্ষুৎপিপাসাকাতর উন্মাদিনী কাঠুরিয়া যুবতীকে ইহা উপহাররূপে দিয়াছিলেন।

শাহজাদা কৌতুহলপূর্ণ স্বরে বলিলেন তোমার এরূপ ছদ্মবেশে আমার শিবিরে গমনের উদ্দেশ্য কি?

পান্না। উদ্দেশ্য—আপনাদের কত ফৌজ, কত রসদ. তাহা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য।

শাহাজাদা। যদি ধরা পড়িতে?

পান্না। কিন্তু ধরিতে পারিয়াছিলেন কি শাহজাদা? আর ধরা পড়িলেও, কার সাধ্য আমায় আটকিয়া রাখে!

শাহজাদা মনে মনে বলিলেন "এই রমণী যথার্থই শক্তিময়ীও

কৌশলময়ী। হায়! এরূপ কোন বুদ্ধিমতী রমণীর সহায়তা যদি আমি পাইতাম।"

শাহজাদাকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া, পান্না বলিল—"রাজকুমার! আমাদের সময় বড় কম। আমি নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া আপনাকে মুক্তি দিতে আসিয়াছি। এখনি আমার সঙ্গে আসুন।"

শাহজাদা। তোমার এ মুক্তিদানের উদ্দেশ্য কি?

পান্না। দুর্ব্বুদ্ধি জনিত পাপের একটা প্রায়শ্চিত্ত বই আর কিছুই নয়। মোগল শিবিরে একরাত্রের আতিথ্য ও পরিচর্য্যার জন্য কৃতজ্ঞতা দেখাইবার অবসর অন্বেষণ! কারাপ্রহরীগণ আমার অর্থে বশীভূত। সজ্জিত অশ্ব ও একজন বিশ্বাসী পথ-প্রদর্শক আপনাকে নিরাপদে শিবিরে পৌছাইয়া দিবার জন্য নিযুক্ত। আপনি বৃথা চিন্তায় সময় নষ্ট করিবেন না। বিলম্ব করিলে আমাদের উভয়েরই বিপদ!"

যুবরাজ বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে, পান্নার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"সর্দ্দারনন্দিনি! তোমায় এ সদাশয়তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি বুঝিলাম, এ পাহাড়ের নিভৃত বুকে, পাষাণের প্রাণহীন রাজত্বে, প্রাণের মহত্ত্ব ও হৃদয়ের উদারতা আছে। কিন্তু তোমার এ চেষ্টা নিস্ফল হইবে। আমি এ স্থান ত্যাগ করিব না।"

পান্না সবিস্ময়ে বলিল—"কেন?"

শাহাজাদা বলিলেন "ভারতী-বিজয়ী আকবরশাহের পুত্র সুলতান দানিয়েল, এক রমণীর সহায়তায় কারাগার হইতে

পলায়ন করিয়াছেন, এ কলঙ্ক যে মৃত্যুযন্ত্রণার চেয়ে ও অধিক পান্না ?"

পান্না চমকিয়া উঠিয়া বলিল—"কিন্তু শাহজাদা ! আপনার জন্য নিষ্ঠুর পাঠান-সর্দ্দারেরা যে কঠোর মৃত্যুর ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহা যে খুবই ভীষণ। প্রভাতেই আপনাকে যে ভূমিমধ্যে আবক্ষ প্রোথিত করিয়া, হত্যা করা হইবে, ।"

শাহজাদা বলিলেন—"যখন যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতি হইয়া আসিয়াছি—তখন জীবনকে অতি তুচ্ছ বলিয়াই জ্ঞান করি। কিন্তু পান্না ! এটুকু জানিও, আমার এক বিন্দু শোণিতপাতে যে প্রচণ্ড দাবানলের সৃষ্টি হইবে—তাহাতে তোমার পিতার রাজ্য যাইবে, পাঠান সর্দ্দারগণ ভস্মীভুত হইবে, এই চির উন্নত পাহাড়, একদিন নিশ্চয়ই শ্মশানবৎ সমভূমিতে পরিণত হইবে !"

পান্না বলিল—"না—না—এ দুইটীর কোনটাই হইতে দিবনা। আপনাকে ও বাঁচাইব, আর আমার নিজের দেশকেও সেই সঙ্গে রক্ষা করিব। আসুন শাহাজাদা ! সময় আমাদের বড় কম। প্রভাতের বেশী বিলম্ব নাই !"

কুমার দানিয়েল, কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা করিয়া বলিলেন --"না না—পান্না ! এরূপ ঘৃণিত পলায়নে আমি আদতেও ইচ্ছুক নই। তোমার এ উদারতার জন্য তোমায় অসংখ্য ধন্যবাদ দিতেছি। এই ঝঞ্ঝাময়ী রজনী প্রভাতে অতি শোচনীয় মৃত্যুই যদি আমার একান্ত ভবিতব্য হয়, তাহাহইলে পরলোকে গিয়াও আমি তোমার এ দয়ার কথা ভুলিব না।"

পান্না বলিল—"এরূপ একটা বাজে নির্ব্বন্ধ লইয়া, সময়ক্ষেপ করায়—বিপদ কেবল আপনার নয়, আমারও সর্ব্বনাশ হইবে! আফ্‌শান যদি কোন গতিকে এখানে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে আমাদের বিষম বিপদ ঘটিবে।"

পান্না, আর কিছু না বলিয়া তখনই বক্ষবসনের মধ্যে লুকানো একখানি শাণিত ছোরা বাহির করিয়া, বলিল—"শাহজাদা! আপনি যদি এ কারাকক্ষ ত্যাগ না করেন, তাহাহইলে আমি এখনই আপনার সমক্ষে আত্মহত্যা করিব। এখনিই এই কারা-প্রকোষ্ঠ নারীর হৃদয় শোণিতে লোহিতবর্ণ ধারণ করিবে।"

পান্নার নেত্রদ্বয় ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। তাঁহার মুখে একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছায়া। সে শাণিত ছুরিকাখানি বাহির করিয়া তাহার নিজের বুকে বসাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময়ে দানিয়েল ব্যাঘ্রের মত লাফাইয়া পড়িয়া, তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন।

তৎপরে বলিলেন—"পান্না! দেখিতেছি খোদার সৃষ্টিতে তুমি অপূর্ব্ব রহস্যময়ী! এক দিন তুমিই কাঠুরিয়া রমণী-রূপে আমায় প্রলোভিত করিয়া তোমাদের দুর্গপ্রবেশের এমন একটা সাংঘাতিক পথ দেখাইয়া দিয়াছিলে, যেখানে প্রবেশ করিয়াই আমি বিপন্ন হইয়াছি। আর সেই সঙ্গে তোমার মোগল-শিবিরে গমনের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইয়াছে। তারপর তুমিই চেষ্টা করিয়া আমায় বন্দী করিয়াছ। এখন আবার করুণাময়ী রূপে আমায় মুক্তি দিতে আসিয়াছ। অগত্যা আমি তোমার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইতেছি। চল—কোথায় যাইতে হইবে?"

পান্নার মুখমণ্ডল এ কথায় সম্পূর্ণ প্রফুল্লভাব ধারণ করিল। সে বলিল—"বিনা বাক্যব্যয়ে আমার সঙ্গে আসুন।"

এক গুপ্তদ্বার দিয়া পুরী হইতে বাহির হইয়া, তাহারা দুর্গ পার্শ্বস্থ এক বিস্তৃত উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিল। বলা বাহুল্য, হিম্মত খাঁ তাহাদের পশ্চাতেই ছিল।

উদ্যানপ্রাচীরের পশ্চিমদিকে আর একটী ক্ষুদ্র লৌহদ্বার ছিল। পান্না—সেই দ্বারের নিকটস্থ হইয়া তাহার চাবি খুলিয়া, হিম্মতকে বলিল—"তোমার অশ্ব কোথায় ?"

হিম্মত। পাহাড়ের নীচে অপেক্ষা করিতেছে।

পান্না। দুইটী অশ্ব প্রস্তুত রাখিয়াছ ?

হিম্মত। হাঁ—মা! তোমার আদেশ পালনে এ হিম্মতখাঁ, কখনই গাফিলি করে না।

পান্না। এই শাহজাদাকে নিরাপদে তাঁহার শিবিরে পৌছিয়া দিয়া, প্রভাতের পূর্ব্বেই আমায় সংবাদ দিতে চাও।

হিম্মত সসম্ভ্রমে সেলাম করিয়া বলিল—"তাহাই করিব মা!"

শাহজাদা পান্নার মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিলেন, তাঁহাকে নিরাপদে কারামুক্ত করিয়া পুরীর বাহির করিয়া দিতে পারিয়া পান্না যেন একটা মহা তৃপ্তি লাভ করিয়াছে। তাহার প্রাণটা খুবই হালুকা হইয়া গিয়াছে।

তিনি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বলিলেন—"পান্না বেগম! তোমার কৃতোপকার এজীবনে কখনও ভুলিব না।"

পান্না সহাস্যমুখে বলিল—"বহুৎ মেহেরবান্ আপনি। কিন্তু আমি যে একটা মস্ত কাজ ভুলিয়াছি।"

এই কথা বলিয়া পান্না তাহার অঙ্গুলী হইতে শাহজাদার সেই অঙ্গুরীয়কটী খুলিয়া লইয়া বলিল—"আমি সে দিন আপনার নিকট হইতে যে জন্য এই অঙ্গুরীয়কটী চাহিয়া লইয়াছিলাম, আমার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইয়াছে। বোধ হয় মনে আছে, আমি আপনাকে সেই সময়ে বলিয়াছিলাম—এই অঙ্গুরীয়ক আমার পছন্দ না হইলে যথাসময়ে ফেরং দিয়া যাইব! শাহজাদা! এ অঙ্গুরীয় সত্যই আমার পছন্দ হয় নাই। কারণ ইহা হইতেই এত বিপদ ঘটিল! আপনি ইহা পুনঃগ্রহণ করুন।"

শাহজাদা দানিয়েল. হাত পাতিয়া সেই অঙ্গুরীয়কটী লইয়া হাস্যমুখে বলিলেন—"পান্না বিবি! তোমার অতবড় একটা অনুরোধ আমি রক্ষা করিলাম। কিন্তু তুমি ভারতসম্রাট আকবর বাদশাহের পুত্র শাহজাদা দানিয়েলের একটা সামান্য উপরোধ রাখিবে না কি?

পান্না শাহজাদার মনের কথা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া বলিল—"কেন রাখিব না রাজকুমার?"

দানিয়েল হাস্যপ্রফুল্লমুখে বলিলেন—"সেদিন রাত্রে এই অঙ্গুরীয় আমি তোমার হাতে পরাইয়া দিবার জন্য চেষ্টা করি, কিন্তু তুমি তাহাতে আপত্তি করিয়াছিলে। আমি খুবই সুখী হইব, যদি এটি আমার স্মৃতিচিহ্ন রূপে তুমি রক্ষা কর। যদি কখনও ভবিষ্যতে, কোন কারণে আমার সহিত তোমার সাক্ষাৎ

করিবার ইচ্ছা হয়, এই অঙ্গুরীয় দেখাইলে, তুমি সসম্মানে আমার সম্মুখে নীত হইবে। এস—আমি তোমার অঙ্গুলীতে আমার কৃতজ্ঞতার সামান্য স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এটি পরাইয়া দিই।"

শাহজাদার এই শিষ্টতাপূর্ণ নির্ব্বন্ধময় উপরোধ পান্না উল্লঙ্ঘন করিতে পারিল না। দানিয়েল তাহার চম্পকলাঞ্ছিত কোমল অঙ্গুলীতে, সেই অঙ্গুরীয় পরাইয়া দিলেন।

পান্না যুবরাজকে একটী ছোট খাট কুর্ণীস্ করিয়া বলিল, "প্রভাতের আর বিলম্ব নাই। যাহা এইমাত্র অতি গোপনে ঘটিয়া গেল, তাহা প্রভাতে নিশ্চয়ই জানাজানি হইয়া পড়িবে। হিম্মত! ইহাঁকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও। জানিও—ইহাঁর নিরাপদ পৌছান সংবাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত, আমি বড়ই চিন্তিত থাকিব!"

শাহজাদা পান্নার মুখের দিকে আর একবার চাহিলেন। তারপর তিনি হিম্মতের সহিত ধীরে ধীরে অপ্রশস্ত ওৎরাই-পথ দিয়া পাহাড়ের নীচে নামিয়া গেলেন।

শাহজাদা তাহার দৃষ্টির বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত, পান্না এক দৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর সে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া দ্রুতপদে সেই স্থান ত্যাগ করিল।

যদি কেহ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিত, তাহা হইলে সে দেখিতে পাইত, পান্নার চক্ষু দুটী জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। এ অশ্রুধারার গূঢ় অর্থ কি, তাহা সেই বলিতে পারে।

পান্না পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র লৌহদ্বার বন্ধ করিয়া, দ্রুতপদে উদ্যান

মধ্য দিয়া পুরী প্রবেশ করিল। কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল—মুনিয়া তখনও ঘুমায় নাই।

মুনিয়াকে দেখিয়া পান্নার চক্ষু আবার জলে ভরিয়া উঠিল।

মুনিয়া সবিস্ময়ে বলিল--"একি! বিবি! তুমি কাঁদিতেছ কেন?"

পান্না তখনই চোখ্ মুছিয়া, তিরস্কারের স্বরে বলিল—"আ মর্! বাঁদি! তোর সবই বিপরীত! শত্রুকে বিদায় দিয়া কেউ কি কখনও কাঁদে?"

বলা বাহুল্য, মুনিয়া তাড়া খাইয়া চুপ করিয়া গেল বটে—কিন্তু তাহার মনে, কি জানি কি কারণে, একটা সন্দেহাগ্নি ধুমায়িত হইয়া উঠিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ঊষার আলোক, পাহাড়ের আশপাশ হইতে উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। পাহাড়ের প্রভাতী শীতলবাতাস, গাছের পাতাগুলিকে কাঁপাইয়া, লতাগুলিকে দোলাইয়া, তাহাদের ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিতেছে। এমন সময়ে আফ্‌শানের নিদ্রাভঙ্গ হইল।

তাড়াতাড়ি চোখ্ মুছিয়া উঠিয়া, সে দেখিল—হাওয়া বারান্দার উন্মুক্ত কক্ষমধ্যে একটী সোফার উপর সে শুইয়া আছে। সে তখনই উঠিয়া বসিয়া, বিস্মিতনেত্রে চারিদিকে চাহিল। কেহই সেখানে নাই।

তাহার মাথামগজ কি এক রকম যেন বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে। আসন ত্যাগ করিয়া সে বারান্দার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। কিয়ৎক্ষণ সেইভাবে দাঁড়াইবার পর, উষাপরশ পবিত্র, পাহাড়ের স্নিগ্ধ প্রভাতসমীর সেবনের সঙ্গে সঙ্গে, সে যেন অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইল।

ক্রমে ক্রমে, গত রাত্রের সমস্ত ঘটনা তাহার মনে পড়িল। পান্নার সেই আলোকোজ্জল কক্ষ, সেই প্রাণভরা আদর সোহাগ, সেই সেরাজি পানের ঘটা, সেই ভালবাসার কথা, সবই একে একে তাহার স্মৃতিপথে জাগিয়া উঠিল। সে মনে মনে ভাবিল, গতরাত্রে সে যেন একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছে। সত্যই কি সে পান্নার কক্ষে ছিল ?

তারপর সে ভাবিল—"আমাকে এই হাওয়া-বারান্দায় এভাবে রাখিয়া গেল কে ? পান্না কি তাহাহইলে তাহার খোজাদের সহায়তায় এই ব্যবস্থা করিয়াছে ? এখানে না পাঠাইয়া, ইচ্ছা করিলেইত সে তাহাকে তাহার শয়নকক্ষে পৌছাইয়া দিতে পারিত। তাহার শয়নকক্ষটিতো এই মহলের পার্শ্বে—খুব নিকটে।

সহসা তাহার মনে সেই মোগলবন্দীর কথা উদিত হইল।

সমস্ত রাত্রিটা সে একরূপ অর্দ্ধ চেতন ও অচেতন অবস্থার মধ্যে কাটাইয়াছে। যে বন্দী তাহার জিম্মায়, একটু পরেই যাহার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে, সারা রাত্রের মধ্যে তাহার কোন সংবাদ না লইয়া, সে যে খুবই একটা বেকুবের মত কাজ করিয়াছে, এইটাই তাহার প্রাণে খুব চাপিয়া বসিল। তাহার জীবনের এই প্রথম কর্ত্তব্যহীনতার কথা ভাবিয়া, সে ভয়ে চমকিয়া উঠিল।

তখনই কারাকক্ষে যাইবার সংকল্প করিয়া সে তাহার আচকানের মধ্যে চাবির সন্ধান করিতে লাগিল। কই জামার জেবের মধ্যে ত চাবি নাই! এ কি সর্ব্বনাশ!"

ভয়ে ও ভাবনায় তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। ক্ষীণ উষালোক সহায়তায়, সে হাওয়া-বারান্দার চারিদিকে চাবির সন্ধান করিল। কিন্তু কোথাও তাহা খুঁজিয়া পাইল না।

তারপর মনে ভাবিল, "গতরাত্রে অতিরিক্ত মদ্যপানে আমার খুবই নেশা হইয়াছিল। আমার বিহ্বল অবস্থা দেখিয়াই পান্না আমাকে এখানে পাঠাইয়া দিয়াছে। খুব সম্ভবতঃ চাবিটা তাহার কক্ষেই পড়িয়া আছে।" এই ভাবিয়া, ত্রস্তপদে আফ্‌শান পান্নার কক্ষের দিকে ছুটিল। কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইয়া জানালা দিয়া দেখিল, কক্ষটী অন্ধকারময়। আর কক্ষদ্বার ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ।

আফ্‌শান পান্নার দ্বারে মৃদু করাঘাত করিয়া, দুই তিনবার ডাকিল—"পান্না! পান্না বিবি! মুনিয়া!"

কেহই তাহার কথার উত্তর দিল না। সবাই ঘোর নিদ্রায় নিমগ্ন। অগত্যা নিরাশচিত্তে আফ্‌শান, বাহির মহলে আসিল।

এই বাহির মহলেই কারাকক্ষ! সে কারাকক্ষের সম্মুখবর্ত্তী হইবামাত্র যে ভীষণ দৃশ্য দেখিল, তাহাতে নিশ্চল পাষাণেরমত হইয়া একটী স্তম্ভের গায়ে ঠেস্ দিয়া দাড়াইল। ভয়ে বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল--"খোদা মেহেরবান! এ কি?"

কিয়ৎক্ষণ পরে স্থির বুদ্ধির বিকাশ হইলে, আফ্‌শান ধীরে ধীরে কারাকক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিল। সবিস্ময়ে দেখিল, কারাকক্ষের দ্বারের দুইজন প্রহরীর একজনের চিহ্নমাত্র নাই। আর একজন অচেতন অবস্থায়, দ্বারের সম্মুখে পড়িয়া আছে!

বিস্মিতনেত্রে চারিদিকে চাহিয়া, আফ্‌শান অস্ফুটস্বরে বলিল—"কে এ সর্ব্বনেশে কাণ্ড করিল? সেই বন্দী কোথায়? তবে কি সে পলাইয়াছে? কি সর্ব্বনাশ! তাহা হইলে যে আমারই জান্ যাইবে—" এই কথা বলিয়া সে কারাকক্ষের দ্বারটী পরীক্ষা করিবামাত্রই দেখিল—কক্ষের চাবিটী সেইদ্বারে লাগানো রহিয়াছে। আর কক্ষমধ্যে অনুসন্ধান করিয়া দেখিল "বন্দী পলাইয়াছে। তাহার শয্যা শূন্য।"

কারাকক্ষের চারিধার, ও দেয়ালের চারিদিক ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবার পর আফ্‌শান বুঝিতে পারিল, এই মোগল বন্দী, নিজের চেষ্টায় পলায়ন করে নাই। কেহ তাহাকে কক্ষ দ্বার খুলিয়াই মুক্তি দিয়াছে!

কিন্তু কে সে? পান্না? না অতি অসম্ভব। ধরিতে গেলে

পান্নার কৌশলেই ত এই মোগল ধরা পড়িয়াছিল। না—তা হইতেই পারে না! পান্নার ইহাতে কোন স্বার্থই নাই।

তবে কে সেই শয়তান, যাহার সহিত এই দণ্ডিত মোগল সেনানীর পলায়নস্বার্থ সম্পূর্ণরূপে বিজড়িত? আর একজন প্রহরীই বা গেল কোথায়! যে প্রহরীটা মৃতবৎ পড়িয়া আছে, তাহারই বা এ শোচনীয় অবস্থা করিল কে?

তীক্ষ্ণবুদ্ধি আফ্‌শান অনেক দিক দিয়া মাথা ঘামাইয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। সহসা তাহার মনে কেমন একটা সন্দেহের ছায়া জাগিয়া উঠিল। সে ভাবিল "পাঠান কখনও এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে না। এই পলায়িতের সঙ্গী অন্য কোন মোগল-সেনানী, হয়তঃ গোপনে পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া বন্দীকে উদ্ধার করিয়া লইয়া চলিয়া গিয়াছে?"

তার পরক্ষণেই সে আবার ভাবিল—"না তাহাও সম্ভবপর নয়! সে এ কারাকক্ষের চাবি পাইবে কিরূপে?"

নানাদিক দিয়া বিবেচনার পর আফ্‌শান স্থির করিল—"এ সমস্যাময় পলায়ন সংবাদ এখনই দুর্গাধিপতিকে দেওয়া উচিত।"

সে তখনই মীরণশার মহলের দিকে ছুটিল। তাঁহার কক্ষের সমীপবর্ত্তী হইয়া দেখিল, দুর্গাধিপতি তখনও নিদ্রিত।

তাঁহার কক্ষদ্বারের কাছে যে প্রহরী ছিল, সে তাহাদের প্রধান সেনাপতিকে অতীব ব্যস্তভাবে কক্ষে করাঘাত করিতে দেখিয়া, বড়ই বিস্মিত হইল। সসম্ভ্রমে একটী সেলাম করিয়া সে

চমকিত ভাবে আফ্‌শানের নিকটস্থ হইয়া বলিল—"ব্যাপার কি জনাব?"

আফ্‌শান উন্মাদের ন্যায় বিকট-দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সরোষে বলিয়া উঠিল—"চোপ্‌রও শয়তান? তোর সকল কথার প্রয়োজন কি?"

সেই প্রহরী ভয়ে দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। সে আর কোনরূপ প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না।

আফ্‌শান তখনই সেই স্থান ত্যাগ করিয়া মন্দুরার দিকে চলিল। একটী দ্রুতগামী অশ্ব, মুহূর্ত্ত মধ্যে সজ্জিত করিয়া সে তখনই উপত্যকা পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

"জনাব! বন্দী পলাইয়াছে!"

"বলিস্ কি?"

"এ বান্দা জনাবের গোলামের গোলাম। জান্-মালেকের কাছে ঝুটা বলিতে সাহস করে না"

"আমি তোদের সকলেরই প্রাণদণ্ড করিব! আফ্‌শান কোথায়?"

"তাঁহারও কোন সন্ধান পাইতেছি না!"

"এও যে খুব তাজব! আফ্‌শান গেল কোথায়?"

"কোন সংবাদ ত তিনি রাখিয়া যান নাই, কেমন করিয়া বলিব জনাবালি?"

কথাগুলি হইতেছিল, আফ্‌জাই বাদ্‌শা মীরণশা ও এক প্রহরীর মধ্যে।

শয্যাত্যাগের পর মীরণশা সবে মাত্র তাঁহার খাস্‌কামরায় আসিয়া বসিয়াছেন, এমন সময়ে, একজন প্রহরী আসিয়া তাঁহাকে এই সংবাদ দিয়াছে। এই প্রহরী একজন হাভিলদার। আফ্‌শান ইহাকেই ভার দিয়াছিল, বন্দীকে বধ্য ভূমিতে লইয়া যাইতে। সে দলবল সহিত আফশানের আদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে গিয়াই, এই অদ্ভুত আবিষ্কার করিয়া, সভয়চিত্তে তাহাদের বাদশাকে সেই কথা জানাইতে আসিয়াছে।

মীরণশা, কথাটা শুনিয়া খুবই বিস্মিত হইলেন। ঘটনা-ক্ষেত্রে গিয়া দেখিলেন, একজন প্রহরীর উদ্দেশ নাই, অপর ব্যক্তি তখনও অচেতন অবস্থায় সেইখানে পড়িয়া গোঁ-গো করিতেছে। কারাকক্ষের যে চাবি, তাহাও দ্বারে লাগান।

দুর্গাধিপতি মীরণশা, সেইখানে দাঁড়াইয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন—"কে এ বিশ্বাসঘাতকতা করিল! তাহাকে কুকুর দিয়া খাওয়াইব। তাহার গায়ের ছাল ছাড়াইয়া লইব—তবে এ বিশ্বাসঘাতকতার ঋণ শোধ হইবে।"

তখনই তিনি তাঁহার শরীররক্ষী একজন সর্দ্দারপ্রহরীকে

ডাকিয়া রুক্ষকণ্ঠে আদেশ করিলেন—"এখনিই পঁচিশজন সওয়ার লইয়া সেই পলায়িত শয়তান আফ্‌শানের সন্ধান কর। যেখান হইতে পার, তাহাকে খুঁজিয়া আনিতেই চাও।"

সর্দ্দার একটী সেলাম করিয়া বলিল—"যো হুকুম!"

সেই সৈনিক দুর্গাধিপতির আদেশ পালনে চলিয়া যাইতে উদ্যত—এমন সময়ে একজন সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া বলিল "জনাব! আমি আসিয়াছি।"

দুর্গাধিপতি সবিস্ময়ে বলিলেন—"একি? আফ্‌শান? কোথায় গিয়াছিলে তুমি?"

আফ্‌শান আভূমি প্রণত সেলাম করিয়া বলিল—"এ বান্দার হাজার কসুর মাফ্‌ হউক। আমি পলায়িত মোগল-বন্দীর সন্ধানে গিয়াছিলাম?

"বন্দী পলাইল কিরূপে?"

"তা জানি না।"

"কারাকক্ষের চাবি তোমার কাছে ছিল। সে চাবি কক্ষদ্বারে লাগান রহিয়াছে, দেখ—ঠিক কিনা?"

"আমি তাহা অনেক আগেই দেখিয়াছি হুজুরালি?"

"ও চাবি এখানে আসিল কিরূপে?"

"তা কিছুই জানি না—বলিতে পারি না।"

"কাল রাত্রে তুমি কোথায় ছিলে?"

"হাওয়া-বারান্দায়?"

"কি প্রয়োজনে সেখানে গিয়াছিলে?"

"আমায় মার্জ্জনা করিবেন। নানাকারণে তাহা আমি বলিতে অশক্ত।"

"বিশ্বাসঘাতক—শয়তান তুমি! এই ব্যাপারটার মধ্যে যে কি ভীষণ রহস্য আছে, তাহা তুমিই জান। কিন্তু প্রকাশ করিতেছ না।"

দুর্গাধিপতি বজ্রনির্ঘোষস্বরে বলিলেন—"এখনি তোমার অস্ত্র ত্যাগ কর।"

আফ্‌শান তাহার কটিদেশ হইতে তরবারি ও হস্তের বর্শা দুর্গাধিপতির সম্মুখে মাটীতে রাখিয়া বলিল—"এ বান্দা চিরদিনই আপনার হুকুমের তামিলদার।"

দুর্গাধিপতি মীরণশা বিকট হাস্যের সহিত বলিলেন—"তা বুঝিয়াছি।" তারপর তিনি নিকটস্থ দুইজন শরীর রক্ষীর দিকে চাহিয়া তাহাদের বলিলেন—"এখনি ইহাকে কারাগারে লইয়া যাও। সর্দ্দারগণকে এখনিই সংবাদ পাঠাইতেছি। তাঁহারাই এর অপরাধের বিচারক।"

মীরণশা, এই আফ্‌শানকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। তাহাকে তিনিই স্নেহবশে প্রধান সেনাপতির পদ দিয়াছিলেন। এই আফ্‌শান চিরদিন বিশ্বাসী, শক্তিশালী, বীরত্ব গৌরবমণ্ডিত কার্য্যকুশল সেনাপতি। বাল্যকাল হইতে তিনি তাহাকে পুত্র নির্ব্বিশেষে পালন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার মহলের সর্ব্বত্রই এই আফ্‌শানের অবাধগতি। তাঁহার কন্যা পান্নার সহিত সে খুবই মেলামেশা করিত, আর এজন্য অনেকে অনুমান

করিত, একদিন এই আফ্‌শানই পান্নাকে পত্নীরূপে লাভ করিয়া পার্ব্বতীয় সর্দ্দারগণের অধিপতি হইবে।

সুতরাং তাহার চিরপ্রিয় আফ্‌শানকে এইভাবে বন্দী করিতে আদেশ করিয়া মীরণশা, বড়ই একটা মর্ম্মযাতনা ভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কর্ত্তব্যের কাছে স্নেহ মায়া মমতা ত কিছুই নয়! তাঁহার যদি পুত্র থাকিত, আর সে পুত্র এইরূপ কোন অপরাধ করিত, তাহাহইলে তিনি এক্ষপস্থলে তাহাকে মার্জ্জনা করিতেন কিনা সন্দেহ! ইহাই পাঠান চরিত্রের বিশিষ্টতা।

তাহার উপর আর একটা কথা এই যে এ ব্যাপারে তাঁহার ষোল আনা হাত ত নাই। তাঁহার অধীনস্থ সর্দ্দারগণই এই মোগল সেনাপতির প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিল। তিনিই প্রস্তাব করিয়া বন্দীকে নিজপ্রাসাদে আবদ্ধ রাখেন। আর তাহার রক্ষকরূপে আফ্‌শানকে নিযুক্ত করেন হায়! হায়! ন্যস্তবিশ্বাসের এই কি পরিণাম?

চিরসতর্ক অতি বুদ্ধিমান যাহারা, বুদ্ধি ও অর্থবল আছে যাহাদের, তাহারা অনেক সময়ে নিজের শক্তির উপর একটা দম্ভময় সাহস লাগাইয়া মনে মনে ভাবে, তাহাদের বুদ্ধির উপর আর কাহারও উঠিবার শক্তি নাই। কিন্তু ভবিতব্য বলিয়া আর একটা মহাশক্তি তাহাদের সকল শক্তি সাহস ও বল বুদ্ধিকে ভাসাইয়া দেয়।

এ ক্ষেত্রে—হইলও তাই। মীরণশা, ও তাঁহার অধীনস্থ সর্দ্দারগণ তাঁহাদের অতিবুদ্ধির দোষে ভাবিয়াছিলেন, যে

এবার মোগলবাহিনীর নায়ক হইয়া আসিয়াছে, সে যখন আমাদের হস্তগত, তখন তাহাকে হত্যা করিতে পারিলেই আমাদের কাজ অর্দ্ধেক হাসিল হইয়া যাইবে। নায়ক ও পরিচালকবিহীন, ভীতিগ্রস্ত মোগল সেনাদলকে বিধ্বস্ত করিতে আমাদের খুব কমই সময় লাগিবে। আর দাম্ভিক আকবর শাহ দ্বিতীয় বার পরাজিত হইলে, তিনি পাঠানের শক্তি যে মোগলের চেয়ে কত বেশী, তাহা বুঝিতে পারিয়া একটা সন্ধি করিতে বাধ্য হইবেন।

কিন্তু এ সুখস্বপ্ন একটী রাত্রি বই টিকিল না। মীরণশা তখনই তাঁহার অধীনস্থ সর্দ্দারগণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সেই দিনের প্রভাতে ঠিক যে সময়ে সেই মোগল বন্দীর প্রাণদণ্ড হইবার কথা ছিল, সেই সময়ে, মীরণশার নিভৃতকক্ষে তাহার পলায়ন ব্যাপারের পরের কর্ত্তব্য কি, তাহা স্থির করিবার জন্য আর একটী ক্ষুদ্র দরবার বসিল। দুর্গাধিপতি মীরণশা, সমস্ত ঘটনা সর্দ্দারদের খুলিয়া বলিলেন। মহাবলী ভীমকায় পাঠান সর্দ্দারগণ, সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া ভ্রুকুটীভঙ্গী করিলেন। যে কার্য্যসিদ্ধির পথ তাঁহারা পূর্ব্বদিনে খুব সোজা করিয়া আনিয়া ছিলেন, তাহা এখন এতটা বাঁকিয়া দাঁড়াইল, যে তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

শাহজাদা দানিয়েল পিতৃপ্রদর্শিত উপায়ে এমন করিয়া কৌশলে সেনা সমাবেশ করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া পাঠান গোয়েন্দাদের মনে একটা ধারণা জন্মিয়াছিল, যে মোগলেরা

এবার অনেক তোপ ও সহস্রাধিক সেনা লইয়া আসিয়াছে। গোয়েন্দাদের আনীত এই সংবাদটা প্রকৃত কিনা, এই সব সর্দারেরা তাহা নির্দ্ধারণের কোন সুযোগই এ পর্য্যন্ত পান নাই। এখন মনে মনে প্রমাদ গণিলেন।

যাইহউক সকল দিক দিয়া পরামর্শের পর, বিচারের পর, বন্দীর পলায়নের ঘটনাগুলি আলোচনার করিবার পর, সমস্ত দোষটাই আফ্‌শানের উপর গিয়া পড়িল।

সর্দ্দার মিয়া মহম্মদ তাঁহার দক্ষিণ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ঊর্দ্ধে তুলিয়া, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া; ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"কি বিশ্বাসঘাতক এই আফ্‌শান খাঁ!!"

তাঁহার পার্শ্বে বসিয়াছিলেন সর্দ্দার রসুল খাঁ। তিনি বহুবার মীরণশাররূপসী কন্যাকে পুত্রবধূ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই আফ্‌শানের জন্যই নিস্ফল হইয়াছিলেন। এজন্য আফ্‌শানের উপর তাঁহার রাগটা কিছু বেশী ছিল। তিনি আরও একটু বেশী চীৎকার করিয়া বলিলেন—"সর্দ্দার সাহেব যাহা বলিয়াছেন তাহাই ঠিক। পাঠান হইয়া যখন আফ্‌শান খাঁ দুষমন্‌কে ছাড়িয়া দিয়া আমাদের বিপন্ন করিয়াছে, তখন এই পলায়িত বন্দীর পরিবর্ত্তে তাহার জান্ লইবার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।"

উপস্থিত তিনি চারিজন সর্দ্দার ঘাড় নাড়িয়া এই মতের সমর্থন করিলেন। তাঁহাদের সকলের মুখেই একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ও প্রতিহিংসার ছায়া। মীরণশা তাহাদের মুখের

দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র, অন্তরে শিহরিয়া উঠিলেন। বুঝিলেন, আফ্‌শানকে এবার এদের কোপাগ্নিতে পড়িয়া ছাই হইয়া যাইতে হইবে! হায়! এই পিতৃমাতৃহীন যুবককে পুত্রবৎ মানুষ করিয়া, তিনি যে রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ দিয়াছিবেন। এই আফ্‌শান যে তাঁর নির্ব্বাচিত জামাতা।

সর্দ্দার মহম্মদ বিরক্তির সহিত বলিলেন—"আফ্‌শানকে এখানে আনিতে আদেশ করুন! আমরা তাহাকে দুই চারিটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। পাঠানের পক্ষে এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা অমার্জ্জনীয়।

মীরণশার ইঙ্গিতে তখনই প্রহরীরা বন্দী আফ্‌শানকে সেই সভাক্ষেত্রে আনিল। এই অল্প সময়ের মধ্যে ভাবনায় চিন্তায়, লজ্জায়, কলঙ্কের ভয়ে, তাহার চিরসুন্দর মুখখানি যেন শবের মত মলিন হইয়া গিয়াছে।

একদিন যে আফ্‌শান, সেনাপতিরূপে সর্দ্দারদের এইরূপ মন্ত্রণাসভায় আদরের সহিত আসন পাইয়াছে, আজ তাহাকে কিনা শৃঙ্খলিত অবস্থায় বন্দীভাবে তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইতে হইল। একেই বলে—ভাগ্য ও ভবিতব্য!

সর্দ্দারগণের মধ্যে যিনি মনে মনে আফ্‌শানের উপর বড়ই বিরক্ত, তিনিই প্রথমে প্রশ্ন করিলেন—"আফ্‌শান খাঁ! সে মোগল বন্দী কোথায়?"

আফ্‌শান, বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া, বিশুষ্কমুখে কম্পিতস্বরে বলিল—"বন্দী পলাইয়াছে!"

"বন্দী ত তোমারই হেফাজতে ছিল আফ্‌শান ?"

"সে কথা আমি অস্বীকার করিতেছি না।"

"আর এই বন্দী পলায়নের জন্য তুমিই সম্পূর্ণ দায়ী।"

"নিশ্চই তাই।"

"এ দায়িত্বের অপব্যবহারের মূল্য কি জান ?"

"না—"

"বন্দীর পরিবর্ত্তে তোমাকে জীবন দিতে হইবে।"

"হোক্! আপনাদের বিচারে যদি তাহাই হয়, মরিতে আমি ভীত নই। তবে একজন নিরীহ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করার একটা কৈফিয়ৎ আছে। সে কৈফিয়তের জন্য মানুষের নিকট না হইলেও, আপনারা খোদার নিকট দায়ী থাকিবেন ?

"কাল রাত্রে তুমি কোথায় ছিলে ?"

"রজনীর প্রথম প্রহর ও দ্বিতীয় প্রহরের অর্দ্ধাংশ কাল আমি পান্নার সহিত এই বন্দীর সম্বন্ধে গল্প করিতে-ছিলাম।"

"তারপর ?"

"তারপর কি ঘটিয়াছিল—আমি তাহা জানি না।"

"রাত্রে তুমি কয়বার এই বন্দীর খপর লইয়াছিলে ?"

"প্রথম প্রহরে একবার।"

"তখন বন্দী তাহার কক্ষে ছিল।"

"নিশ্চয়ই !"

"তারপর ?"

"তারপর কি ঘটিয়াছিল, তাহা আমি জানি না। আমায় তাহা জিজ্ঞাসা করিবেন না।"

সর্দ্দারেরা পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করিয়া, মীরণশার কাণে কাণে কি বলিলেন। মীরণশা কিয়ৎক্ষণ গম্ভীর-মুখে থাকিয়া, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিলেন—"আফ্‌শান!"

আফশান বলিল—"অনুমতি করুন জনাব?"

"সর্দ্দারেরা তোমায় বিশ্বাসঘাতক বলিয়া সন্দেহ করিতেছেন।"

"তাঁহারা করিতে পারেন। কিন্তু খোদা. জানেন, আমি নিরপরাধী। তবে কর্ত্তব্যহীনতার একটা অভিযোগ, উহারা আমার বিরুদ্ধে আনিতে পারেন বটে।"

"কিন্তু সে কর্ত্তব্যহীনতার দণ্ড, অতি ভয়ানক! তোমার এই গাফিলির জন্য আফ্‌জাই রাজ্যের মহা অনিষ্ট ঘটিয়াছে। জান ত তুমি, আমার অধীনস্থ সর্দ্দারদের সহিত পরামর্শ না করিয়া আমি কোন কাজ করি না। এই ঘৃণিত অপরাধে ইঁহাদের মতে—প্রাণদণ্ডই তোমার শাস্তি! বন্দীর জন্য যে খাত খনিত হইয়াছে তাহাতে তোমাকে প্রোথিত করা হইবে। আফ্‌শান! মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।"

এই কঠোর দণ্ডাজ্ঞা প্রকাশ করিবার সময় মীরণশার চোখে জল আসিল। তাঁহার পাষাণের মত কঠিন প্রাণ যেন শতধাচূর্ণ হইয়া গেল।

কিন্তু কঠোর কর্ত্তব্য তাঁহার সন্মুখে। অপরাধীর বিরুদ্ধে

সমস্ত প্রমাণ তাঁহার চোখের উপর। নিজের পুত্র থাকিলে তিনি তাহাকে এরূপ কঠোর অপরাধের জন্য মার্জ্জনা করিতেন কিনা, তদ্বিষয়ে ঘোর সন্দেহ।

এই ভীষণ দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া, আফ্‌শান যুক্তকরে, ঊর্দ্ধনেত্রে বলিল—"খোদা! মেরে মেহেরবান্ খোদা! বড়ই আফ্‌শোষ রহিল, যে আজ আমাকে বিশ্বাসঘাতকতার কালিমা মাখিয়া মরিতে হইতেছে!"

মীরণশা আর এ শোচনীয় দৃশ্য দেখিতে না পারিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন—"আজ আমার দক্ষিণ বাহু ইচ্ছা করিয়া ছেদন করিলাম। হায়! চির ইমানদার আফ্‌শান!"

পাষাণে বুক বাঁধিয়া তিনি তখনই প্রহরীদের সংকেতসূচক ইঙ্গিত করিলেন। প্রহরীরা আফ্‌শানকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইতে উদ্যত, এমন সময়ে উন্মাদিনীর মত, নিতান্ত লজ্জাহীনার মত, পান্না সেই সভাগৃহে প্রবেশ করিয়া অশ্রুপ্লুত নেত্রে বলিল—"দোহাই খোদার! দোহাই আপনাদের রাজদণ্ডের! দোহাই পাঠান রাজ্যের সনাতন ব্যবস্থার! আপনারা এক নিরপরাধীর প্রাণদণ্ড করিবেন না! আফ্‌শান এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। এই মোগল-সেনাপতিকে আমিই মুক্ত করিয়া দিয়াছি। এই নির্দ্দোষী আফ্‌শানকে আপনারা যে চরম দণ্ডে দণ্ডিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সে দণ্ড আমারই হওয়া উচিত। যদি নারীহৃদয়ের শোণিত দানে এই কৃতাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হয়, পাঠান-সাম্রাজ্যের ন্যায় দণ্ডের মর্য্যাদা রক্ষা হয়,

তাহা হইলে এখনই আপনারা আমাকে হত্যা করুন। এই নির্দ্দোষী, উন্নতচরিত্র, কলঙ্কমাত্রবিহীন সেনাপতি আফ্‌শান খাঁকে মুক্তি দিন।"

সেই মন্ত্রণাসভায় যে কয়জন ছিলেন, সকলেই বিস্ময় স্তম্ভিত। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করিলেন—এই পান্না আফ্‌শানকে খুবই ভালবাসে, এজন্য তাহার জীবন রক্ষার জন্য সমস্ত অপরাধ নিজের স্কন্ধে লইতেছে!

একজন প্রবীণ বয়োবৃদ্ধ সর্দ্দার প্রশ্ন করিলেন—"কেন এ ভয়ানক কাজ করিলে তুমি পান্না?"

পান্না দর্পভরে উত্তর করিল—"বিবেকের তাড়নায়, কর্ত্তব্যের মর্য্যাদারক্ষার জন্য, আমি সেই বন্দীকে মুক্তি দিয়াছি। সে আমার চেষ্টাতেই বন্দী হয়, তাহাকে মুক্ত করিবার অধিকার, বোধ হয় আমা বই আর কাহারও নাই।"

সেই বৃদ্ধ সর্দ্দার অপেক্ষাকৃত রূঢ়স্বরে বলিলেন—"যে আমাদের দেশের শত্রু, যে আমাদের ঘরের সন্ধান লইতে আসিয়াছিল, তাহাকে মুক্তি দান করার কর্ত্তব্যজ্ঞানটা দেখিতেছি, তোমার বয়সের চেয়েও যেন খুব বেশী!"

পান্না, সর্দ্দারের এই কঠোর বিদ্রূপে বড়ই রুষ্টা হইল। সে দর্পভরে বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গী করিয়া বলিল—"যদি এই মোগলবন্দীর পরিচয় আপনি জানিতেন, তাহাহইলে বোধ হয় এরূপ কথা বলিতেন না। তাঁহাকে মুক্তি দিয়া, আমি আমার জন্মভূমির হিতার্থে এক মহা কর্ত্তব্যই পালন করিয়াছি।

সর্দ্দার বলিলেন—"কে সেই মোগল-সেনানী, যার মুক্তির জন্য তোমার এতটা সমবেদনা ?"

পান্নার চক্ষু দুটী জ্বলিয়া উঠিল। ক্রোধে, অভিমানে, তাহার নাসারন্ধ্র স্ফীত হইল। পান্না তীব্রস্বরে বলিল—"সর্দ্দার সাহেব! সেই বন্দী আর কেহই নহেন—সম্রাট আকবরের পুত্র শাহজাদা দানিয়েল! যদি আপনারা তাঁহাকে হত্যা করিতেন, তাহার পরিণামে, চারিদিকে আগুণ জ্বলিয়া উঠিত। পুত্রহত্যার প্রতিশোধের জন্য ভীষণ আগুণ জ্বালাইয়া আকবর-শাহ এই আফ্‌জাই সাম্রাজ্যকে শ্মশানে পরিণত করিতেন। কত অর্থ আপনাদের ? কত সেনা বল আপনাদের ? দিল্লীর সম্রাট আকবরশাহের শক্তির তুলনায়, আপনাদের শক্তি কত বেশী তাহা একবার ভাবিবার অবসর পাইয়াছেন কি ?"

পান্নার মুখে এই কথা শুনিয়া সর্দ্দারেরা সকলেই চমকিয়া উঠিলেন। মীরণশা বন্দীকে দেখিয়াই যে সন্দেহ করিয়াছিলেন, তাহা কঠোর সত্যে পরিণত হইল। সর্দ্দারদের মধ্যে দুই একজন মনে মনে বলিলেন—"পান্না যাহা বলিয়াছে, তাহাই ঠিক। সে যাহা করিয়াছে, তাহা পাঠান রমণীর ও মীরণশার কন্যার উপযুক্ত কাজই হইয়াছে! শাহজাদা দানিয়েলকে হত্যা করিলে সত্যই মহা বিপদ ঘটিত।

আর আফ্‌শান ? সে তখনই সমস্ত কথা বুঝিতে পারিল। আর বুঝিল, পান্নার হৃদয় কি উপাদানে গঠিত! এই দীপ্তিময়ী পান্না, অন্তরে বাহিরে সমানভাবে সৌন্দর্য্যশালিনী।

গতরাত্রে পান্না যাহা কিছু করিয়াছিল ধীরে ধীরে গুছাইয়া, সবই সেই সভার সমক্ষে বলিয়া গেল।

পান্নার কথা শুনিয়া সর্দ্দারদের সকলেই দারুণ বিস্ময় স্তম্ভিত। তবুও এই সব অধীনস্থ সর্দ্দারগণের সমক্ষে, পান্নার এই কার্য্যের জন্য মীরণশার গর্ব্বোন্নত মস্তকটী যেন একেবারে নুইয়া পড়িল। এ যে বিশ্বাসঘাতকতা! রাজদ্রোহিতা! আর তাঁহার কন্যাই যে এই ভীষণ অপরাধে অপরাধিনী। সে ত ইচ্ছা করিলে, তাঁহাকে সব কথা জানাইতে পারিত। তিনি স্বহস্তে বন্দীকে মুক্ত করিয়া দিলে এরূপ কলঙ্ক ঘটিত না।

মীরণশা মনে মনে বলিলেন—"হায়! হতভাগিনী পান্না! কেন আমার এ সর্ব্বনাশ করিলি? আমার চিরসমুন্নত মস্তক যে আজ তোর এই ঘৃণিত কার্য্যে মাটীতে নুইয়া পড়িল"

মীরণশা এই সর্দ্দারগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সর্দ্দারেরা তাঁহার অধীনস্থ সামন্ত-নরপতি। সুতরাং এই ভীষণ যুদ্ধের সময়ে এই সর্দ্দারগণ তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ।

কেন—না সকলের সমবেত সেনাবলের সাহায্য না পাইলে আকবর শাহের আক্রমণের প্রতিরোধ করা, একা মীরণশার ক্ষমতায় হইতে পারে না। সকল সর্দ্দারকেই যে মীরণশা প্রীতির চক্ষে দেখিতেন—তাহাও নহে। কিন্তু নিজের রাজ্য স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য, তাঁহাদের সমবেত শক্তির সাহায্যের আশায়, চিরদিনই মনের ভাব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া চলিতেন। তাঁহার কন্যার অপরাধের বিচার ভার যে সর্দ্দারেরা

নিজের হাতে লইবেন না তাঁহার উপরই দিবেন, তাহাও তিনি বুঝিলেন। যদি তাই হয় তখন পান্নার দশা কি হইবে? পাঠানরাজ্যের সনাতন বিধানমতে, ইতিপূর্ব্বে এরূপ রাজ-বিদ্রোহীর যে প্রাণদণ্ড হইয়া গিয়াছে! তাহা হইলে কি তাঁহারই আদেশে, তাঁহার আঁধারের ধ্রুবতারা এই পান্না মরিবে?

মীরণশা যাহা মনে মনে ভাবিতেছিলেন, তাহাই ঘটিল। সর্দ্দারগণের মধ্যে যাঁহারা অগ্রণী, তাঁহাদের এক জন যেন তাঁহার মনের ভাব পরীক্ষার জন্য বলিলেন—"জনাব! এ ক্ষেত্রে আমাদের কর্ত্তব্য কি?"

মীরণশা গম্ভীরমুখে বলিলেন—"যাহা কর্ত্তব্য, যাহা ন্যায্য বিচার, তাহাই আপনারা করুন। আপনাদের বিচারফল যাহা হইবে, তাহাতে আমি কোন অমতই করিব না। রাজমুকুট, ও রাজদণ্ড ধারণের দায়িত্ব—বড়ই বৈচিত্রময়। অতি কঠোর। অবশ্য আমার কন্যা বলিয়া আমি পান্নাকে মার্জ্জনা করিতেও ইচ্ছুক নহি। আর আমার নিজের সংসারের মধ্যে যে হীন অপরাধের সূচনা—তাহার বিচারক আপনারা।"

মীরণশাহের এই কথায়, সর্দ্দারগণ একটা বিষম সমস্যার মধ্যে পড়িলেন। কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় ভাবে তাঁহারা মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা এ ক্ষেত্রে কি যে ব্যবস্থা করিবেন, তাহাও খুঁজিয়া পাইলেন না।

কিয়ৎক্ষণের জন্য সকলেই মৌনবাক অবস্থায় রহিলেন। কেননা ব্যাপার বড় গুরুতর, আর সমস্যাও বড় কঠিন।

কারণ, মীরণশার কন্যার অপরাধ অতি সাংঘাতিক। তাহার শাস্তি হইতেছে প্রাণদণ্ড। পাহাড়ী-রাজ্যের আইনই হইতেছে তাই! কিন্তু কার সাধ্য, এ আদেশ মীরণশার সম্মুখে প্রকাশ করিতে পারে?

মৌনভঙ্গ করিয়া মীরণশাহ বলিলেন—"যাহা কর্ত্তব্য, তাহা যতদূর কঠোর হউক না কেন, আমাকে পালন করিতেই হইবে। পিতৃত্বের দাবি, স্নেহ মায়া, নিজের সুখ ও স্বার্থ, যদি কর্ত্তব্য মুখে বলি দিতে আজ সংকোচ বোধ করি, তাহা হইলে বুঝিব বৃথা আমি এ রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছি। পান্নার হৃদয়ের শোণিতে যদি তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, সে ব্যবস্থাতেও অনিচ্ছুক নই। কিন্তু নারীহত্যা পাঠানের চক্ষে অতি ভীষণ পাপ। তাহা হইলেও প্রয়োজন ও কর্ত্তব্যের মুখে এরূপ ক্ষেত্রে তাহাও পাপ নহে। আমার বিচারে পান্নাকে এখন নজরবন্দী করিয়া রাখিলেই বোধ হয় তাহার এই ভীষণ অপরাধের প্রচুর শাস্তি হইবে। আর তাহার এই নির্ব্বুদ্ধিতার দোষে, যদি এই যুদ্ধে আমাদের পরাজয় হয়, তাহা হইলে, এই দায়িত্বজ্ঞান বিহীন আফ্‌গানই পান্নার হৃদয়ের শোণিত আকর্ষণ করিবে।"

মীরণশাহের এই ভীষণ আদেশ শুনিয়া সবাই নিস্তব্ধ। বোধ হইতেছিল, সে সভাস্থলে যেন জন প্রাণীও নাই।

মীরণশাহ আর কিছু না বলিয়া, পান্নাকে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া, তাহারই কক্ষ মধ্যে তাহাকে নজরবন্দী করিয়া রাখিলেন। সেই কক্ষের চারিদিকে যমদূতের মত

ভীষণ দর্শন কাফ্রি-খোজার পাহারার বন্দোবস্ত হইল। আর পান্নার সাঙ্গনীরূপে রহিল—কেবলমাত্র মুনিয়া। বলা বাহুল্য, পাষাণে বুক বাঁধিয়া, মীরণশাহ কন্যার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করাও বন্ধ করিলেন। ইহাকেই বলে ভাগ্যচক্র! ইহাই হইতেছে কর্ম্মফল!

পান্নার মনের অবস্থা অতি শোচনীয়। সে ভাবনায় চিন্তায় সূর্য্যাতপদগ্ধ স্থলপদ্মের ন্যায় দিন দিন শুখাইয়া যাইতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পান্নার আহারে রুচি নাই, শয়নে সুনিদ্রা নাই, সে হাসিভরা মুখ নাই। মুনিয়ার সঙ্গে দিনরাত ছল করিয়া বিবাদ করার সে প্রবৃত্তি নাই। অত স্নেহময় পিতা যিনি, তিনি কোন খোঁজ খপর লইতেছেন না, তাহার জন্য তাহার তিলমাত্র দুঃখও নাই। সে যেন কি এক রকম হইয়া গিয়াছে!

মুনিয়া পান্নাকে নানা উপায়ে স্বান্তনা দিবার চেষ্টা করে, নানাদিক দিয়া বুঝায়। আর পান্না, নিস্তব্ধভাবে মুনিয়ার সকল কথাই শুনিয়া যায়। হাঁ—না, ভালমন্দ, কিছুই বলে না।

এত কষ্টদুঃখের মধ্যেও তাহার মনের প্রধান সন্তোষ, যে

শাহজাদা নিরাপদে শিবিরে পৌঁছিয়াছেন। কেন না, হিম্মতখাঁ পরদিনই তাহাকে এ সংবাদ অতি গোপনে জানাইয়া গিয়া গিয়াছে।

হিম্মতের উপর কাহারও সন্দেহ পড়ে নাই। কারণ কারাগারের একজন প্রহরী চির নিরুদ্দেশ। অপরজন, চেতনা লাভ করার পর যখন শুনিল, মোগলবন্দী পলাইয়াছে ও গাফিলির দরুণ অত বড় সেনাপতি আফ্‌শানখাঁ—তাহাদের বাদ্‌শার কোপানলে পড়িয়া কারাবদ্ধ হইয়াছেন, তখন সেই হতভাগ্য প্রহরীও একদিন রাত্রে সুযোগ বুঝিয়া, জন্মের মত মীরণগড় ত্যাগ করিল। সুতরাং হিম্মতের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবার আর কেহ রহিল না। সে এ যাত্রা বাঁচিয়া গেল।

বলা বাহুল্য, হিম্মত দুর্গাধিপতি মীরণশাহেরও বিশ্বাস হারাইল না। হিম্মতই পান্নাকে বাল্যকাল হইতে মানুষ করিয়াছে, সুতরাং তিনি পান্নার কারাকক্ষের চাবিটি হিম্মতের জিম্মাতেই রাখিয়া দিলেন।

হিম্মতখাঁর মনে বহুবার ইচ্ছা হইয়াছিল, যে সে তাহার প্রভুর নিকট গিয়া বলে, আমার চেষ্টাতেই বন্দী পলাইয়াছে। দোষ আফ্‌শানের নয়, পান্নামতিরও নয়। আমিই মোগলের টাকা খাইয়া, তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছি। কিন্তু সে তাহা পারিল না। একথা বলিলেও কোন ফল হইবে না। কারণ পান্না যে তাহাকে সকল দিকে বাঁচাইয়া গিয়াছে। এ ক্ষেত্রে সকল দোষ নিজের স্কন্ধে লইলেও কেহ তাহার কথায় তখন বিশ্বাস করিবে না। সকলেই

ভাবিবে, বাল্যকাল হইতে মানুষ করিয়াছে বলিয়া এই বৃদ্ধ হিম্মত, পান্নার কৃত সমস্ত অপরাধ নিজের স্কন্ধে লইতেছে।

তারপর হিম্মত এটুকুও ভাবিল—“যে উপায়ে মোগল শাহজাদাকে উদ্ধার করিয়াছি, সে উপায়ে যদি পান্নাকে কারামুক্ত করিতে পারি, তাহা হইলে পান্নাকে লইয়া এমন এক গোপনীয় স্থানে লুকাইয়া রাখিব, যে কেহই তাহার সন্ধান পাইবে না।”

এইজন্য মীরণশা যখন হিম্মতকে ডাকিয়া বলিলেন—“পান্নার সহিত আমার সকল সম্পর্ক বোধ হয় শেষ হইয়াছে। কিন্তু তুমি তাহাকে এখনও স্নেহ কর। অতএব পান্নার কারাকক্ষের চাবি এখন তোমার নিকটই থাক্।” তখন দুর্গাধিপতির এ কঠোর আদেশ, বৃদ্ধ হিম্মতখাঁ মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিল—আর মনে মনে বলিল—“পাহাড়ের বাদ্‌সা! এখন বুঝিলাম খোদা আমার পান্নারাণীকে রক্ষা করিবার জন্য, তোমার মনে এরূপ একটা প্রবৃত্তি জাগাইয়া দিয়াছেন। তাহা না হইলে, এত কাণ্ড করিয়া আমিই বা পান্নার রক্ষার ভার পাইব কেন?

দিন আসে—আবার রাত্রির কোলে সমগ্র বিশ্বকে সমর্পণ করিয়া, সে সে দিনের মত চলিয়া যায়। রাত্রি অন্ধকার লইয়া যেমন আসিত তেমনই আসে। আকাশ আলো করিয়া চাঁদ উঠে। হীরকখণ্ডের জ্যোতিকে নিন্দিত করিয়া, কোটী কোটী তারকা নীল আকাশে ঠিক তেমনি করিয়া ছড়াইয়া পড়ে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে পান্নারও দিনরাত কাটে।

এইভাবে তিন চারিদিন কাটিল। হিম্মতের তত্ত্বাবধানে,

মুনিয়ার পরিচর্য্যায়, তাহার অন্য কষ্ট নাই। কিন্তু তাহার কষ্টের মধ্যে প্রধান কষ্ট—যে সে তাহার স্বাধীনতা হারাইয়াছে। মুক্ত বিহঙ্গিনীর মত, সে যে নদীর কূলে, ঝরণার পাশে, আঙ্গুরের ক্ষেতে, কুঞ্জের শ্যাম তরুচ্ছায়ায় বেড়াইয়া বেড়াইত, সে মুক্ত স্বাধীনতা তাহার গিয়াছে। এইজন্য অধীনতার কষ্টটা তাহার বুকে বড়ই বাজিয়াছে।

মুনিয়া অনেক সময় আগেই ঘুমাইয়া পড়িত। পান্নাও শয্যায় শুইত বটে—কিন্তু ঘুমাইতে পারিত না। তাহার বোধ হইত, কে যেন তাহার সেই সুকোমল শয্যায় অনলকণা ছড়াইয়া দিয়াছে।

সে তখনই প্রাণের জ্বালায়, গাত্রদাহে অধীর হইয়া মলিনমুখে বাতায়নপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইত। নীলাকাশের চারিদিকে ছড়ানো, হীরকখণ্ডবৎ তারকামণ্ডলীর দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিত। তারপর একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া শয্যায় ফিরিয়া আসিত। শয্যায় শুইয়া সে তাহার মৃতা জননীর জন্য কাঁদিত। কত মর্ম্মভেদী আকুল নিশ্বাস ফেলিত। তাহার নেত্রনির্গত সমুষ্ণ অশ্রুধারায় উপাধান ভিজিয়া যাইত। আর কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্লান্ত হইয়া সে ঘুমাইয়া পড়িত। কিন্তু এ নিদ্রাতেও তার নিস্তার নাই। স্বপ্ন আসিয়া, তাহাকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত।

সে স্বপ্নে দেখিত, যেন দিব্যকান্তিময়ী মা তাহার, শয্যা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, তাহার চূর্ণ অলকগুলি গুছাইয়া দিতেছেন।

তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছেন। আর তাহার কাণের কাছে নীচু হইয়া অস্ফুট স্নেহময়স্বরে বলিতেছেন,—"আয়! পান্নামতি! আয় মা! আমার আমার সঙ্গে সেই চিরশান্তিময় রাজ্যে, যেখানে শোক নাই, জ্বালা নাই, অত্যাচার নাই, পীড়ন নাই, তাড়না নাই, নিষ্ঠুরতা নাই। আমি তোকে ছাড়িয়া যাওয়ার পর হইতে তুই যে অনেক কষ্ট সহিয়াছিস্ মা! বাপে কন্যাকে অযত্ন করিতে পারে, সহোদরে পারে, শ্বশ্রুতে পারে, সকলে পারে, কিন্তু মা—পারে না।

এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া পান্নার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। সে ভয়চকিত হৃদয়ে শয্যার চারিদিকে চাহিয়া দেখে। কই—কেউ ত তাহার শয্যাপার্শ্বে নাই। কেউ ত সেই কক্ষ মধ্যে নাই!

এইভাবেই পান্নার দিনগুলি কাটিয়াছে। পিতা ত এ কয়দিন তাহার কোন সংবাদই লয়েন নাই। কিন্তু যে আফ্‌শানখাঁ তাহাকে অত ভালবাসে, সেও কোন তত্ত্ব লয় নাই কেন? আবার সে ভাবে বেচারা আফ্‌শানকে এ অনুপস্থিতির জন্য দোষী করিলে চলিবে কেন? সেত তাহারই জন্য কারা-নিক্ষিপ্ত হইল, সর্ব্বসমক্ষে অতটা লাঞ্ছিত হইল। এইরূপে পান্নার দিন কাটিতে লাগিল।

ইহার পরের দিনের মধ্যাহ্নে, আফ্‌শান অতি বিষণ্ণমুখে পান্নার কক্ষদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল।

সে কক্ষদ্বারে স্বয়ং হিম্মতখাঁ বর্ত্তমান। হিম্মত আফ্‌শানের উপর ততটা সন্তুষ্ট নয়। কিন্তু মনে যাহাই থাকুক, মুখে সে

কোনরূপ বিরক্তিভাব প্রকাশ করিত না। আর করিবার কোন এক্তিয়ারই যে তাহার নাই।

দ্বারে বসিয়াছিল এই হিম্মতখাঁ। আফ্‌শান আসিয়া হিম্মতকে বলিল—"সেখজী! একবার পান্নাবিবিকে সংবাদ দাও—যে আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।"

হিম্মত বলিল—"জানেন ত খাঁ সাহেব! আমাদের বাদশার হুকুম বড় কড়া। তাঁহার সহী করা পাঞ্জার ছাড় না হইলে, এ কক্ষে আর কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। মধ্য হইতে আমারই জান্ যাইবে।"

হিম্মতের মনের ইচ্ছা এই, আফ্‌শানের সঙ্গে যাহাতে পান্নার সাক্ষাৎটা আর না হয়।

কিন্তু আফ্‌শান এ ব্যাপারের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল। সে মীরণশার সহী-মোহরযুক্ত এক খানি কাগজ, হিম্মতকে দেখাইয়া বলিল—"আমিও যে বাদশার আদেশ জানি না—তা নয়। সেজন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছি।"

ইহার উপর ত আর কথা চলে না। কাজেই হিম্মতখাঁ পান্নার নিকটে গিয়া আফ্‌শানের আগমন সংবাদ জানাইল।

পান্নামতি বলিল—"কেন এ সময়ে তাঁর সাক্ষাতের কি প্রয়োজন?"

হিম্মত। কিছুই তিনি খুলিয়া বলেন নাই।

পান্না। তাঁহাকে বল গিয়া, আমার তবিয়ৎ বড় ভাল নয়। আর একদিন আসিতে।

হিম্মত বলিল—"তাহাই বলিতেছি" এই কথা বলিয়া সে চলিয়া যাইতে উদ্যত, এমন সময়ে পান্না মনে মনে কি ভাবিয়া বলিল—"না নিষেধ করিও না হিম্মত! তাহাকে আসিতে দাও?"

ইহার কয়েক মুহূর্ত্ত পরে আফ্‌শান মলিন মুখে সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল—"তোমার তবিয়ৎ কেমন আছে পান্না বিবি!"

পান্না আফ্‌শানের মুখের দিকে একটী উদাস দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিল—"আফ্‌শান! আমায় তুমি মার্জ্জনা কর।" সে আর বলিতে পারিল না।

পান্নার চোখে জল। কণ্ঠস্বর উচ্ছাসরুদ্ধ। সে অশ্রুজল আফ্‌শানের বুকে যেন বিষাক্ত শেলের মত বিদ্ধ হইল। সভায় সকলের সম্মুখে, সে যখন অতি হীন বন্দীর মত শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় দাঁড়াইয়াছিল, তখনও তাহার মনে এত কষ্ট হয় নাই। যখন তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল, তখনও সে একটুও বিচলিত হয় নাই। কিন্তু পান্নার চোখে জল দেখিয়া, সে আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। সে ধীরভাবে বলিল—"কেন পান্নামতি! আমার কাছে মার্জ্জনা চাহিতেছ? তুমিত আমার নিকট কোন অপরাধই কর নাই?"

পান্না চোখের জল মুছিয়া বলিল—"যে অপরাধী, সেই তাহার নিজের অপরাধের গুরুত্ব বুঝিতে পারে। আমার কৃতাপরাধের গুরুত্ব আমি নিজে এখন বুঝিয়াছি। আমার জন্যই ত তোমার এ লাঞ্ছনা ঘটিল আফ্‌শান!"

আফ্‌শান প্রসন্নমুখে বলিল—"হোক! শত লাঞ্ছনা হোক—তবু ভাবিব, যে পান্নার জন্য আমাকে এ সব লাঞ্ছনা-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে। সে চিন্তাতেও আমার সুখ যে পান্না! যাহা হইয়া গিয়াছে—তাহা ভুলিয়া যাও। আর যাহা করিয়াছ—তাহা ফিরাইবার কোন উপায় নাই।"

আফ্‌শানের প্রাণের এ সহানুভূতি দেখিয়া, পান্না মনের দারুণ কষ্ট ভুলিল। সে অপেক্ষাকৃত প্রফুল্লমুখে বলিল—"কি মনে করিয়া আসিয়াছ আফ্‌শান?"

আফ্‌শান। তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে?

পান্না। কি কথা!

আফ্‌শান। আমার কাছে সত্য বল দেখি, ঐ মোগল বন্দী কে?

পান্না। সত্যই শাহজাদা দানিয়েল!

আফ্‌শান। শাহজাদা দানিয়েল। আকবরশার পুত্র?

পান্না। হাঁ।

আফ্‌শান। তুমি কেমন করিয়া তাঁর পরিচয় জানিলে?

পান্না তখন তাহার ছদ্মবেশে মোগলশিবিরে গমনের কথা আফশানকে সবই খুলিয়া বলিল।

আফ্‌শান বিস্মিতচিত্তে বলিল—"মন্ত্রণাসভায় এ কথা প্রকাশের পূর্ব্বে, আমায় বল নাই কেন?"

পান্না। বলিবার কোনও প্রয়োজন হয় নাই। তবে পিতাকে বলিয়াছিলাম যে আমি ছদ্মবেশে মোগল শিবিরে গিয়াছিলাম!

আফ্‌শান কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া মলিনমুখে বলিল— "শাহজাদাকে ছাড়িয়া দিয়া সুবুদ্ধির কাজ কর নাই—পান্নাবিবি! এবার দেখিতেছি, আমাদের নিস্তার নাই। এটা স্থির জানিও আকবরশা যখন তাঁর পুত্রকে সেনাপতি করিয়া পাঠাইয়াছেন তখন এ রাজ্য জয় করিবার জন্য অনেক সেনাই সেই পুত্রের সঙ্গে আসিয়াছে। বন্দী আমাদের হাতে থাকিলে, আমরা সুবিধাজনক সর্ত্তে, সন্ধি করিতে পারিতাম। যাক্ যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা ফিরাইবার উপায় নাই। নসীবে যাহা আছে, তার জন্য নসীবই দায়ী। মানুষ নয়। কিন্তু একটা কথা বড়ই আমার চোখে গোলমেলে ঠেকিতেছে। সেই বন্দীকে তুমিই ত চেষ্টা করিয়া ধরাইয়া দাও! তবে আবার তাহাকে ছাড়িয়া দিলে কেন? আমি তো তোমার জন্য সকল বিপদের মুখে যাইতে প্রস্তুত। আমায় বলিলেই ত তোমার বুদ্ধির উপরে গিয়া, নূতন কৌশল বাহির করিয়া, আমিই বন্দীকে খালাস করিয়া দিতে পারিতাম। হয়তঃ সেই মুক্তিদানের সঙ্গেসঙ্গেই আমাদের যুদ্ধের ব্যাপারটাও মিটিয়া যাইত। সকল দিক রক্ষা হইত।"

আফ্‌শানের যুক্তিগুলি নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। পান্না কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া আফ্‌শানের কথাগুলি মনে মনে তোলাপাড়া করিয়া বলিল—"তুমি যাহা বলিয়াছ তাহাও ঠিক, যাহা এই মাত্র বলিলে তাহাও ঠিক! সবই নসীব—আফ্‌শান! সবই নসীব!"

আফ্‌শান দেখিল, পান্না তাহার কৃতকার্য্যের জন্য বড়ই

অনুতপ্ত হইয়াছে। কিন্তু একটা কথা তখনও তাহার মনের মধ্যে বিষম সন্দেহের কৃষ্ণছায়া আনিয়া দিতেছিল। সে কালো ছায়াটা কোনমতেই মুছিতেছিল না।

সুতরাং সে পুনরায় পান্নাকে বলিল—"একটী কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করিব পান্না! তাহার সদুত্তর দিবে কি?"

পান্না বলিল—"তোমার কাছে সবই যখন আমি খুলিয়া বলিলাম আফ্‌শান! তখন আর কিছুই গোপন করিব না।"

আফ্‌শান। "ধরিতে গেলে, তোমার চেষ্টাতেই শাহজাদা বন্দী হইয়াছিল। তাহার প্রতি তোমার এতটা সহানুভূতির কারণ কি?"

এত দুঃখের সময়েও পান্নার মুখে হাসি আসিল। সে একটু বিরক্ত ভাবে বলিল—"এখনও তোঁমার সেই সন্দেহ গেল না আফ্‌শান! আমি নিজেই ঠিক্ বুঝিতে পারিতেছি না, যে আমাদের দুষমন—তাহার উপর আমার এতটা দয়া, এতটা সহানুভুতি জন্মিল কেন? সবই নসীব!

আফ্‌শান এ সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করা যুক্তিযুক্ত ভাবিল না। কথাটা অন্যদিকে ঘুরাইয়া লইবার জন্য, সে বলিল—"এখন এ নজরবন্দী ভাবে কতদিন কাটাইবে?"

পান্না বিমর্ষমুখে বলিল—"কি করিয়া জানিব নসীবে কি আছে? সবই খোদার মরজি।"

আফ্‌শান মুখখানা খুব গম্ভীর করিয়া বলিল— আমি প্রতিকারের একটা উপায় স্থির করিয়াছি।"

পান্না। কি উপায় ?

আফ্‌শান। আমার এ সেনাপতিগিরিতে ঘৃণা জন্মিয়াছে। তুমি যদি স্বীকার কর, তাহা হইলে আমি একটা কথা তোমাকে জানাইতে সাহস করি।

পান্না। কথাটা না শুনিলে প্রতিশ্রুতি করিব কিরূপে ?

আফ্‌শান। আমি তোমাকে এ নজরবন্দীর অবস্থা হইতে মুক্ত করিতে চাই। পান্না! তোমার এ অবস্থা দেখিয়া আমার বুক কাটিয়া যাইতেছে।

পান্না। তুমি ভুল বুঝিয়াছ—আফ্‌শান! পাঠানের ঘরে জন্মিয়াছি। জন্মাবধি মাতৃহীনা আমি। কঠোর, নিষ্ঠুর, মমতা-হীন প্রভাবের মধ্যে, পাষাণের বুকে আমি লালিত-পালিত। কাজেই আমি—পাষাণী। আমার সহিষ্ণুতা খুবই বেশী। আমি চাই, নশীবের শক্তি পরীক্ষা করিতে! আমি চাই, নশীবকে বাধা দিতে। আমি চাই মরীচিকাবৎ ছলনাময়, পাষাণবৎ সুদৃঢ় এই নশীবকে চূর্ণবিচূর্ণ করিতে! আর কখনও আমার কাছে পলায়নের প্রস্তাব করিও না। দুনিয়ায় আর কোথাও আমার কবর রচিত হইবে না—হইবে এই আফ্‌জাই উপত্যকার বুকে! ভবিষ্যতে আর কখনও তুমি আমার সম্মুখে ওরূপ হীন প্রস্তাব করিও না।

পান্না চুপ করিল। তাহার মুখের ভাব, দৃঢ়প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক। তাহার স্বর, নির্ব্বন্ধের তীব্র ঝঙ্কারময়। তাহার চক্ষে, উজ্জ্বল বিদ্যুৎ।

এমন সময়ে হিম্মত খাঁ, সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া পান্নাকে বলিল,—"সহসা হয় ত তোমার পিতা এদিকে আসিতে পারেন। তাহাহইলে—আমায় যে বড়ই লাঞ্ছিত হইতে হইবে পান্না বিবি!"

কথাটা পান্নাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইলেও, আফ্‌শান ইঙ্গিতে বুঝিল, প্রকারান্তরে হিম্মত তাহাকেই সেই স্থান হইতে চলিয়া যাইতে ইসারা করিতেছে।

যাইবার সময় পান্নাকে আর কোন কথা না বলিয়া, আফ্‌শান ধীরে ধীরে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। আর সে কক্ষের বাহির হইয়া গেলে, হিম্মত যেন হাঁফ্ ছাড়িয়া বাচিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

পান্নাকে নজরবন্দী করিয়া রাখার পর, তিন চারি দিন কাটিয়া গিয়াছে। এই কয় দিন দুর্গাধিপতি মীরণশা—য়ণাবশে দারুণ মর্ম্মবেদনায়, পান্নার কোন খোঁজ খপরই লয়েন নাই।

তাহা হইলেও তিনি কন্যার শোচনীয় পরিণাম ভাবিয়া বড়ই শঙ্কিত হইতেছিলেন। এই সর্দ্দারদের সমবেত শক্তিই, তাঁহার বাহুবল। তাহারা পান্নাকে এখন নজরবন্দী করিয়া রাখিয়াই ক্ষান্ত আছে বটে, কিন্তু যুদ্ধে পরাজয় ঘটিলে, তাহারা মরিয়া হইয়া উঠিবে। তখন পান্নাকে তাহারা বোধ হয় হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না।

মীরাণশা, চিন্তিতভাবে তাঁহার কক্ষমধ্যে দ্রুত পদচারণা করিতেছেন। তাঁহার মুখে একটা দারুণ উৎকণ্ঠার ছায়া।

এমন সময়ে একজন পদাতিক ত্রস্তভাবে আসিয়া সংবাদ দিল, "জনাব! মোগল-শিবির হইতে একজন দূত আসিয়াছেন।"

আফ্জাইপতি মীরাণশাহ সহসা তাঁহার পুরীমধ্যে মোগল-দূতের আবির্ভাবে, যেন একটু উতলা হইয়া উঠিলেন। শত্রু শিবির হইতে অকস্মাৎ এই দূত আসিবার কারণ যে কি, তিনি স্থির করিতে পারিলেন না।

সন্দিগ্ধচিত্তে তিনি প্রহরীকে বলিলেন,—"সম্মানের সহিত রাজদূতকে এখানে লইয়া আইস।"

প্রহরী কিয়ৎক্ষণ পরে, একজন অস্ত্রধারী প্রৌঢ়ব্যক্তিকে মীরাণশার সম্মুখে উপস্থিত করিল।

মীরাণশা, এই লোককে আর কখনও দেখেন নাই। তাহা হইলেও রাজ-দূত যিনি, সনাতন রাজতন্ত্রের বিধানে চিরদিনই তিনি সম্মানের পাত্র।

সুতরাং মীরাণশাহ অতি সমাদরে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধণা করিয়া আসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিয়া বলিলেন,—"আপনি কি লাহোর—হইতে আসিতেছেন?"

সেই দূত উত্তর করিলেন,—"না—আফ্জাই উপত্যকার মোগল শিবির হইতে আসিতেছি।"

"সুলতান দানিয়েল আপনাকে পাঠাইয়াছেন?"

"জনাবের অনুমান সত্য!"

"আপনার আগমনের উদ্দেশ্য কি ?"

"সন্ধিস্থাপন।"

"কি স্বত্বে ?"

"মাত্র দুইটী করারে। আমাদের প্রথম করার এই, আপনি মোগল-সরকারে একটা মোটা রকম বার্ষিক নজরানা, দশটা হস্তী, একশত পার্ব্বতীয় অশ্ব উপহার দিবেন। এ রাজ্য আপনারই থাকিবে। আর আমরা শিবির তুলিয়া বিনাযুদ্ধে এখান হইতে চলিয়া যাইব।"

"তারপর দ্বিতীয়টি কি ?"

"শাহজাদা দানিয়েলের হস্তে আপনাকে কন্যা দান করিতে হইবে। শুনিয়াছি, ঐ কন্যাই আপনার একমাত্র সন্তান।"

কথাটা শুনিয়া মীরাণশা একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখে একটা উত্তেজনার লক্ষণ দেখা দিল।

তিনি কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া, একটু বিদ্রূপমিশ্রিত স্বরে বলিলেন,—"আপনাদের প্রথম প্রস্তাবটী যুদ্ধের পূর্ব্বেই আমার কাছে আর একজন রাজদূত আনিয়াছিলেন। আর দ্বিতীয় প্রস্তাবটী—সম্পূর্ণ নূতন। ইহা আপনারই মুখেই প্রথম শুনিতেছি। আপনার প্রথম প্রস্তাবটীতে হয়তো সম্মত হইতে পারি, কিন্তু দ্বিতীয়টীতে আদৌ নয়।"

সেই আগন্তুক প্রণিধি বলিলেন,—"প্রথমটীর অপেক্ষা দ্বিতীয়টী যে আরও সহজ! মোগল-রাজবংশে যখন দর্পিত

রাজপুত পর্য্যন্ত কন্যা দান করিয়াছেন তখন এই পাঠানের স্বধর্ম্মী মোগলেকে স্বধর্ম্মী কন্যাদানের আপত্তি কি?"

মারাণশা, সেই প্রণিধির মুখের দিকে একটী মর্ম্মভেদী দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"এরূপ প্রস্তাব কি আপনার বাদশাহ করিয়াছেন?"

"না—এ প্রস্তাবটি বাদশাহের প্রতিনিধি, রাজকুমার দানিয়েলের।"

"শাহজাদা অবশ্য এটা বোধ হয়, একটা কৃতজ্ঞতার হিসাবেই করিয়াছেন। কেন না—আমার কন্যা পান্নামতিই আপনাদের রাজকুমারের কারাগার হইতে নিরাপদ পলায়নের সমস্ত ব্যবস্থাই করিয়া দিয়াছিল।"

"হইতে পারে: আমি বার্ত্তাবাহক দূত মাত্র। আপনার সম্মতি অসম্মতির কথা রাজশিবিরে বহন করাই, আমার ন্যস্ত কর্ত্তব্য।"

মারাণশা কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া তাঁহার হেনারঞ্জিত পক্কশ্মশ্রুর মধ্যে শুভ্রঅঙ্গুলি গুলি প্রবেশ করাইয়া দিয়া, বলিতে লাগিলেন, "হাঁ—সবই বুঝিয়াছি! আর এও বুঝিতেছি, চতুরতার দিক দিয়া গেলে, পাঠান অপেক্ষা মোগলই শ্রেষ্ঠ। আমার অবর্ত্তমানে এই কন্যাই আমার সিংহাসনের অধিকারিণী। এ পার্ব্বত্যরাজ্য তার। আপনাদের শাহজাদার পক্ষে বাহুবলে যে রাজ্য জয় করা বড়ই দুরূহ কাজ, কৌশলে পান্নাকে করায়ত্ত করিয়া—এই পাঠান রাজ্যের দুর্গকেতনে মোগল পতাকা উড়াইয়া দেওয়া, তার

তুলনায় অতি সহজ কাজ। বিনা রক্তপাতে, বিনা প্রাণীক্ষয়ে, বিনা পরিশ্রমে, রাজনৈতিক কেনাবেচার দিক দিয়া দেখিতে গেলে—মোগলই এ বিষয়ে বেশী লাভবান হইবে! কিন্তু পাহাড়িয়া পাঠান আমরা, অতটা ব্যবসাদারীতে এখনও অভ্যস্ত হই নাই। আপনাদের শাহজাদাকে বলিবেন—তাঁহার কোন প্রস্তাবেই আমি স্বীকৃত নই। তাঁহার সহিত যদি আমার সাক্ষাৎ হওয়া কখনও সম্ভবপর হয়, তাহাহইলে আমি বোধ হয়, অতি সহজে খুব ভাল করিয়া তাঁহাকে এ কথাটী বুঝাইয়া দিতে পারিব।"

সেই প্রণিধি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া সহাস্যমুখে বলিলেন, "সত্যই যদি আপনি শাহজাদার সাক্ষাৎ পান, তাহাহইলে এইরূপ পরুষ ভাবে তাঁহার মুখের উপর এই প্রকার জবাব দিতে পারিবেন কি জনাব?"

এই কথা বলিয়াই সেই আগন্তুক প্রণিধি তখনই তাঁহার কৃত্রিম শ্মশ্রু উন্মোচন করিলেন।

মীরণশা সবিস্ময়ে দেখিলেন—সেই প্রৌঢ়মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে এক কোমল, নবীনকায়, সুন্দর যুবক তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। আগেকার সেই রাজদূত, যেন মায়াবলে অদৃশ্য হইয়াছে!

মীরাণশা, একটু স্থিরভাবে লক্ষ্য করিবার পর বুঝিতে পারিলেন, ইনিই সেই পলায়িত রাজকুমার সুলতান দানিয়েল।

মীরাণশা দেখিলেন নিয়তিচলিত হইয়া, শীকার আবার তাঁহার হস্তগত। তিনি প্রহরীদের সঙ্কেত করিবার জন্য তাঁহার

বক্ষবসন মধ্য হইতে, একটী বংশী বাহির করিবামাত্রেই, শাহজাদা বলিলেন—"সাবধান! অত বড় হীন কাজটা করিবেন না। আমি রাজদূত। সম্রাট আকবরের প্রতিনিধি। সভ্যজগতের সীমার বাহিরে, পর্ব্বত-মণ্ডিত পাঠানের দেশে, পাঠানের রাজনীতি শাস্ত্রে, বোধ হয় রাজদূতকে বন্দী করার এইরূপ কোন একটা নিয়ম আছে—তাই আপনি এত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।"

মীরণশা শাহজাদার এই বিদ্রূপাত্মক বাক্যে প্রকৃতিস্থ হইয়া, সেই বংশীটি তাঁহার বক্ষবসন মধ্যে রাখিলেন। অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ ভাবে বলিলেন,—"শাহজাদা! আপনার সাহস অতি ভয়ানক। কি দুঃসাহসে আপনি একাকী এই শত্রুপুরীতে আবার প্রবেশ করিলেন?

শাহজাদা মৃদু হাস্যের সহিত বলিলেন,—"পলায়িত মোগল বন্দী যে আবার এইরূপ অবস্থায়, আপনাদের সহিত একাকী সাক্ষাৎ করিতে আসিতে পারে, তাহাই দেখাইবার জন্য! যাই হোক যখন আত্মপ্রকাশ করিয়াছি, আর আমি বিলম্ব করিতে পারি না। আপনি যে এইমাত্র বলিয়াছেন, মোগল শাহজাদাকে সম্মুখে পাইলে সকল কথা তাহাকে খুলিয়া বলিতে পারেন!

মীরাণশাহ মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া বলিলেন—"আমি আপনার পিতাকে হস্তী ও অশ্ব উপহার দিতে পারি, কিন্তু তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া নিয়মিত রূপে বার্ষিক করদানে ইচ্ছুক নই।"

শাহজাদা। এই আপনার শেষ কথা!

মীরাণ-শা। নিশ্চয়ই তাই!

শাহজাদা। আর আপনার কন্যার সম্বন্ধে প্রস্তাবটি?

মীরণ-শা। আমার কন্যা বাক্‌দত্তা।

শাহজাদা। আপনারি নির্ব্বাচিত এ ভাগ্যবান পাত্রটী কে?

মীরাণ-শা। এই যুদ্ধের সেনাপতি—আমার পুত্রোপম আফ্‌শান খাঁ।

"বহুৎ খুব! আপনার এই জবাবই আকবর শাহের নিকট পাঠাইব। আদাব!" এই কথা বলিয়া শাহজাদা দানিয়েল সেই কক্ষ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন।

মীরাণ শা বলিলেন - "আপনার সঙ্গে দশজন শরীররক্ষী সেনা দিই। তাহারা আপনাকে নিরাপদে আমার রাজধানীর বাহির করিয়া দিয়া আসিবে।"

শাহজাদা সহাস্যবদনে বলিলেন—"জনাব! আপনার এ সদাশয়তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ দিতেছি! বাহিরে আমার শিক্ষিত অশ্ব অপেক্ষা করিতেছে। আমার কটিদেশেও এই সুশাণিত তরবারি রহিয়াছে। অশ্ব ও তরবারি থাকিলে, মোগল কাহাকেও ভয় করে না।

শাহজাদা তখনই সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া প্রাঙ্গণে আবদ্ধ তাঁহার অশ্বোপরি উঠিলেন। তৎপরে নির্ভয় চিত্তে ধীরেধীরে পাঠান দুর্গ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

আর এমন একটা সুযোগ পাইয়া, মোগল রাজকুমারকে পুনরায় অবরুদ্ধ করিতে পারিলেন না—কঠোর রাজনৈতিক

বিধান তাঁহার হস্তপদকে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিল—ইহা ভাবিয়া মীরাণ শা, আফ্‌শোষে ওষ্ঠাধর দংশন করিতে লাগিলেন।

এক নির্জ্জন কক্ষমধ্যে মীরাণ-শার সহিত এই ছদ্মবেশী রাজ-দূতরূপী শাহজাদা দানিয়েলের কথোপকথন হইতেছিল। অন্য কেহ সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত না থাকিলেও, একজন অতি গোপনে থাকিয়া সবই লক্ষ্য করিতেছিল। আর কৌতুহলবশে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে যে সব কথোপকথন হইয়াছিল, সবই সে অতি মনোযোগের সহিত শুনিয়াছিল। তার পর যখন সে দেখিল, এই আগন্তুক রাজদূত স্বয়ং শাহাজাদা দানিয়েল, তখন তাহার ধমনীতে প্রতিহিংসার তপ্তশোণিত প্রবাহ ছুটিতে লাগিল। মুখমণ্ডল ভীষণ উত্তেজনাময় হইয়া উঠিল। এই ব্যক্তি আর কেউ নয়—আফ্‌শান খাঁ।

আদ্যোপান্ত সব কথাই সে শুনিয়াছিল। আফ্‌শান যখন শুনিল—শাহজাদা, পান্নার হস্তপ্রার্থী—আর তাহার বুকের রত্নটীকে ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে, তখন সে একাবারে মরিয়া হইয়া উঠিল। যে কোন উপায়ে শাহজাদাকে বন্দী করিবার বাসনা তাহার মনে বড়ই প্রবল হইয়া পড়িল। কিন্তু সকল দেশের রাজবিধানেই রাজদূতের উপর কোনরূপ অত্যাচার করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। মীরাণ শা নিজেই একটা দুর্ব্বলতার ও রাজনৈতিক বন্ধনের মধ্যে পড়িয়া এইমাত্র যে কাজ করিতে অশক্ত হইলেন, তাহার পুনরাভিনয় কখনই তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারি দ্বারা হইতে পারে না।

সুতরাং সে মনে মনে সংকল্প স্থির করিল "এই মোগল শাহজাদা আমাদের দুর্গের সীমা পরিত্যাগ করিলেই, আমি তাহাকে আক্রমণ করিয়া বন্দী করিব।"

এইরূপ একটা অদমনীয় সংকল্প হৃদয়ে পোষণ করিয়া, আফ্‌শান তখনই তাহাদের ছাউনিতে চলিয়া গেল। তথা হইতে দশজন বলিষ্ঠ পাঠানসেনা লইয়া, একটী সহজ পথ দিয়া উপত্যকার নিম্নে নামিয়া এক সমতল ভূমিখণ্ডের পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া রহিল।

তাহার মনে কেমন একটা ধারণা জন্মিল যে শাহজাদা দুঃসাহসে ভর করিয়া একাকাই শত্রুপুরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আর যেদিক দিয়াই তিনি শিবিরে যান না কেন— এই পথ দিয়া না গেলে এই জঙ্গলের বাহিরের উপত্যকায় যাইবার আর কোন উপায় নাই।

তাহার অনুমিত আশা পূর্ণ হইল। সে দেখিল—শাহজাদা দ্রুতবেগে অশ্ব ছুটাইয়া, তাহার ঘাটির দিকেই আসিতেছেন।

আফ্‌শান দ্রুতবেগে সসৈন্যে আসিয়া শাহজাদার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল।

শাহজাদা আফ্‌শানকে দেখিবামাত্রই চিনিলেন। তখন তাঁহার সেই পক্বশ্মশ্রু আবৃত প্রৌঢ়মূর্ত্তি নাই। সুতরাং আফ্‌শানও তাহাকে সহজেই চিনিতে পারিল।

অশ্বরশ্মি সংযত করিয়া শাহজাদা বলিলেন,—"কেন বৃথা মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিবে? আমার পথ ছাড়িয়া দাও।"

আফ্‌শান সরোষে বলিল,—"এ পথ কখনই ছাড়িব না। তবে তোমার মৃত্যুর পথ উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছি।"

"মূর্খ পাঠান! মোগলকে আজও চিনিতে পার নাই?" বলিয়া, শাহজাদা সজোরে তূর্য্যধ্বনি করিলেন। তখনই সেই বনান্তরাল হইতে পঞ্চাশজন মোগল পদাতিক বাহির হইয়া আসিয়া আফ্‌শানের সেনাদলকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিল।

সমশের নামক এক মোগল সেনাপতির অব্যর্থ বর্শার আঘাতে, আফ্‌শান ভূপতিত হইল। পশ্চাৎ দিক হইতে এরূপ অতর্কিত আক্রমণের জন্য সে প্রস্তুত ছিল না, আর এত মোগল সেনা যে শাহজাদা সেই স্থানে লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন—তাহাও সে স্বপ্নে কল্পনা করে নাই।

আহত আফ্‌শান তাহার তরবারি আকর্ষণ করিতেছে দেখিয়া আর একজন বলিষ্ঠ মোগল সেনা, তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া তরবারি উঠাইল।

শাহজাদা বজ্রনির্ঘোষ স্বরে আদেশ করিলেন,—"মুনাইম্! ঐ আহত শয়তানকে হত্যা করিও না—বন্দী কর!"

বলা বাহুল্য, আফ্‌শান তখনই মোগল সেনার হস্তে বন্দী হইল। আর তাহার সঙ্গী দশজন পাঠান সেনানীর দশা, তাহার অপেক্ষা বড় অল্প শোচনীয় হইল না।

আফ্‌শান এখন বুঝিল—সুসভ্য মোগল অনেক বিষয়ে পাঠানের অপেক্ষা একটু বেশী বুদ্ধি খরচ করিয়া কাজ করে।

দশম পরিচ্ছেদ।

কোন কার্য্য উপলক্ষে, মুনিয়া প্রাসাদের অন্য এক দিকে গিয়াছে। আর পান্না তাহার কক্ষে একা বসিয়া, কত কি ভাবিতেছে।

শরৎকাল। পাহাড়ের উপর চাঁদোয়ার মত অনন্ত বিস্তৃত সুনীলিম আকাশখণ্ড সম্পূর্ণরূপে মেঘশূন্য। চারিদিকেই উজ্জল অবিচ্ছিন্ন নীলিমার অফুরন্ত রাজত্ব।

বাহিরের প্রাকৃতি খুবই উজ্জ্বল। পাহাড়ের চূড়ার উপর, তরুশীর্ষে, গলিত স্বর্ণবৎ সূর্য্যকিরণ খুবই চিক্‌মিক করিতেছিল। সেই চিক্‌মিকে সূর্য্যকিরণের উত্তপ্ত নিশ্বাস মাখিয়া, পাহাড়িয়া পাখীগুলা নীলাকাশতলে চঞ্চলগতিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছিল। কখনও তাহাদের ক্ষুদ্র কণ্ঠনিঃসৃত বিবিধ সুরকাকলীতে নির্জ্জন গগনকোল মৃদুভাবে প্রতিধ্বনিত করিতেছিল। কেন না ধ্বনি যেমন উঠিতেছে--প্রতিধ্বনি তখনই তাহা লুফিয়া লইয়া দিক-দিগন্তে ছড়াইতেছে।

আগে আগে যখন তাহার সুখের দিন ছিল, প্রাণভরা আনন্দ ছিল, সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ছিল, পান্না সেই সময়ে মধ্যাহ্নের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া খুবই মোহিত হইত। কখনও ঘনপল্লবাবৃত শ্যামকুঞ্জছায়ে, কখনও বা সুবৃহৎ পাষাণস্তূপের ছায়ার আড়ালে, কখনও বা ধীরে প্রবাহিত তুষারশীতল সলিলসম্পদময়ী স্নিগ্ধ

নির্ঝরিণী কূলে বসিয়া সে বড়ই একটা বিচিত্র আনন্দ উপভোগ করিত।

নিভৃত বনান্তরে শ্যামপল্লবের বুকে মুখ লুকাইয়া, পাপিয়া ডাকিত "পিউ—পিউ—পিউ"। পান্না তখনই তাহার স্বরের অনুকরণ করিয়া ডাকিত—"পিউ—পিউ"। পাখীটা বোধ হয় মানুষের অব্যর্থ অনুকরণে ত্যক্ত হইয়া, সে স্থান হইতে তখনই উড়িয়া যাইত।

পাহাড়ের সমুচ্চ শিখরে কোনদিন ধূসরবর্ণ মেঘের ব্যাপকতা দেখিয়া ময়ূর কে-কা রবে মর্ম্মস্পর্শী রব করিত। সে রবে পাহাড়ের উপত্যকা, জঙ্গল, নিভৃত নির্ঝরিণীর পাষাণ বক্ষ পর্য্যন্ত কি যেন একটা তীব্র মাধুরীভরা সুরের ঝঙ্কারে, প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিত। আর নিজের সুরে নিজেই আত্মবিস্মৃত হইয়া, প্রেমিক শিখী অসংখ্য চন্দ্রকশোভিত পক্ষ বিস্তার করিয়া শিখিনীর সহিত আনন্দে নৃত্য করিত। সেই সময়ে এ অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া পান্না মনে মনে খুবই একটা আনন্দ উপভোগ করিত। এখনও প্রকৃতির বুকে, মধুর শরতে এই সব বিচিত্র লীলার অভিনয় হইতেছে বটে, কিন্তু পান্নার চোখে, তাহা হইতে যেন সকল আনন্দ ঝরিয়া পড়িয়াছে। তাহা যেন অতি তিক্ত, একান্ত রসহীন, চিত্তের বড়ই অতৃপ্তিকর।

মানুষের মনে যখন বর্ষার বন্যার মত চারিদিক হইতে দুশ্চিন্তার প্রবলধারা প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন সে ভাবিয়া উঠিতে পারে না, কোন বিষয়টা লইয়া সে একটু বেশী চিন্তা

করিবে। কাজেই সে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট বস্তুর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, তাহার সকল ভাবনার মধ্যে যেটা বেশী বড়, সেইটাই ভাবিতে থাকে। পান্নারও সেই অবস্থা হইয়াছিল। পান্না আকাশের দিকে চাহিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার চিন্তা ব্যোম-পথের আরও উপরে চলিয়া গিয়াছিল।

সে যেন আজকাল তাহার চিত্তের উপর আধিপত্য হারাইয়াছে। যে চিত্তরাজ্যে, যে বিস্তৃত মনঃক্ষেত্রে,তাহার শক্তিই অতি প্রবল রূপে বিরাজ করিতেছিল, আজ কাল যেন সেই প্রবল ইচ্ছাশক্তির উপায়ে কে যেন একটা অধীনতার শৃঙ্খল পরাইয়া দিয়া গিয়াছে। সে এখন আর তাহার ইচ্ছাশক্তিকে স্বেচ্ছামত লাগাম ধরিয়া চালাইতে পারে না।

পিতা তাহাকে নজরবন্দী করিয়া রাখিয়াছেন—সেই জন্যই কি তার মনোকষ্ট? তা বোধ হয় নয়। মুনিয়ার মিষ্ট কথা, পরি-চর্য্যা হিম্মতের স্নেহময় ব্যবহার তাহার নিজের সজ্জিত বাসকক্ষ তাহাকে এই নজরবন্দী অবস্থার সকল কষ্ট ভুলাইয়া দিয়াছে।

প্রকৃত কথা বলিতে গেলে—আফ্‌শানকে অনেকটা প্রশ্রয় দিলেও তাহার অন্তর খুঁজিলে যেন একটা বিরক্তির অস্ফুট ছায়া দেখা যাইত। তাহার কারণ - আফ্‌শান বড় রূঢ়, বড়ই বিশৃঙ্খল, বড়ই মদিরাসক্ত। তবে পিতার স্বার্থ বুঝিয়া সে আফ্‌শানের সহিত বাহিই একটা স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করিত। বিশেষতঃ মোগলের সহিত প্রথম যুদ্ধে, আফ্‌শান যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, তাহা বাস্তবিকই খুব একটা বাহাদুরীর কথা।

সে অনেক সময় একথাও ভাবিয়াছে, যে ভবিতব্যবশে, বা পিতার আদেশে, এই আফ্‌শানকে যদি বিবাহ করিতে হয়, তাহাতেও সে স্বীকৃত হইবে। কেন না—আফ্‌শান চরিত্রের দুর্ব্বলতা দোষগুণ, সবই সে জানিত। কি করিয়া আফ্‌শানের দুর্ব্বল প্রবৃত্তি গুলিকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, তাহাও সে ভাবিয়া রাখিয়াছিল। আর আফ্‌শান যে তাহাকে খুব ভয় করিয়া চলিত, তাহাও তাহার অপরিজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু আজকাল কে জানে কি কারণে, আফ্‌শানের চিন্তাটা তাহার চিত্তক্ষেত্রে সেরূপ আধিপত্য বিকাশ করিতে পারিত না। কেন না—আর একটা উজ্জ্বল ছায়া, আজকাল, তাহার মর্ম্মস্থলের সমস্ত স্থানটাকে আবরিত করিয়া ফেলিয়াছিল।

পান্না মনে মনে ভাবিল--"যদি এ যুদ্ধে যদি আমাদের পরাজয় হয়, তাহা হইলে কি হইবে? এই শাহজাদা দানিয়েল কি তখন আমার মুখের দিকে চাহিবেন? আমার পিতার সহিত সুবিধাকর সর্ত্তে সন্ধি করিতে স্বীকৃত হইবেন? যদি না হন, তাহা হইলে আমার পিতার দশা কি হইবে?

এইরূপ নানাভাবের চিন্তাই এই সময়ে তাহার মনের মধ্যে প্রলয়ের ঝড়ের মত উঠিয়া, তাহাকে বড়ই ব্যাকুল করিয়া তুলিত। এ সব বিষম সমস্যার সমাধান করিতে না পারিয়া, সে ঝটিকা-প্রহত লতিকার মত মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িত। তাহার কৃতকার্য্যের জন্য অনুতাপ করিত। তাহাতে যেন সে একটু শান্তি পাইত।

তারপর গভীর রাত্রে, নিদ্রার ব্যাঘাতে, সে বাতায়ন-পথে আসিয়া দাঁড়াইত। তাহার দৃষ্টি পড়িত সেই দিকে—যে দিকে মোগল-শিবির অবস্থিত। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে শাহজাদা দানিয়েলের কামকমনীয় রূপরাশি, তাহার মন আর অন্ধকারময় হৃদয়কে, খুবই উজ্জ্বল করিয়া দিত। ধ্রুবতারা দেখিলে পথ ভ্রান্ত পথিকের যে আনন্দ হয়, মরুভূমে বিস্তীর্ণ সরসী দেখিলে তৃষিত মরুপথবাহীর যে আনন্দ হয়,সে যেন সেইরূপ একটা বিমল আনন্দ পাইত। তাহার বিষণ্ণতার স্থানে প্রসন্নতা আসিয়া দেখা দিত। তুষারপ্লাবিত শীতের স্থানে, যেন বসন্ত আবির্ভূত হইত।

চুম্বকে যেমন সজোরে লৌহকে টানিয়া লইয়া যায়, নদীর প্রবল স্রোত যেমন তৃণকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, তাহার ক্ষুদ্র প্রাণটী অনেক সময় সেই ভাবে, এই শাহজাদার চিন্তায় ডুবিয়া যাইত।

পান্না ভাবিত,কেন এমন হয়? যে আমার শত্রু, তাহার উপর আমায় এ আকর্ষণ কেন? যে এক দিনেই আমাদের এ সুখের নীড়ে আগুণ ধরাইয়া তাহা ছারেখারে দিতে পারে, তাহাকে যেন আবার একবার দেখিতে পাইলে সুখী হই—এ অদ্ভূত আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে আসে কেন? আবার তাহার পাশে দাঁড়াইতে, তাহার কথা শুনিতে, তাহার সাহচর্য্যজনিত আনন্দ উপভোগ করিতে কেন এক আকুল বাসনা এই প্রাণকে, মেঘাবৃত আকাশের মত ছাইয়া ফেলে?

তেমন কামকমনীয় রমণীমোহনরূপ লইয়া কি আর কেহ এ

ধরায় আসে নাই ? তাঁহার শীলতা, সহানুভূতি, মিষ্টকথা কি এ দুনিয়ায় আর কাহারও নাই ? তবে কেন - এ—আকর্ষণ ? কেন এ দুরাকাঙ্ক্ষা ? কেন এ হৃদয় বিপ্লবকারী চিন্তা ?

পান্না অনেকদিক দিয়া এরূপ ভাবব্যাকুলতার কারণানুসন্ধান করে, কিন্তু প্রত্যক্ষ কারণরূপে কোন কিছুই সে দেখিতে পায় না। পায়—একটা ব্যাকুলতা, একটা নিরাশা, একটা মর্ম্মবেদনা আর তজ্জনিত অবর্ণনীয় কষ্ট যাহাতে হাত বুলাইবার লোক নাই।

এই ভাবে, এইরূপ ঝটিকান্দোলনের মধ্যে, আশা নিরাশার সন্ধিস্থলে পড়িয়া, পান্নার দুঃখের দিনগুলি কাটিতেছে।

আফশান তাহাকে সে দিন বলিয়াছিল—"মানুষের হাত কোন বিষয়েই নাই পান্না। সবই নসীব!"

পান্না এই জন্য আজকাল মনে মনে প্রায়ই বলিত— "দেখিতে চাই নসীব! তুমি কত শক্তিময়, কত ছলনাময়, কত নিষ্ঠুর, কতটা সমবেদনা বিহীন! দেখিতে চাই, অশ্রুজলে তুমি গলিয়া যাও কিনা—অন্তরের জ্বালাময় নিশ্বাসে তুমি পুড়িয়া ছাই হও কি না ? যখন ডুবিয়াছি, তখন ভাল করিয়াই ডুবিব। দেখিতে চাই আমি—যে তুমি আমার আর কি বেশী দুর্দ্দশা করিতে পার!"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সম্রাটপুত্র দানিয়েল খুব ভালরূপই জানিতেন, এই বন্দী পাঠান আফ্‌শান খাঁ—পাঠানদের সেনাপতি। তিনি বুঝিলেন, নিয়তির ছলনায় মুগ্ধ হইয়া এই আফ্‌শান তাঁহার জালে আপনিই আসিয়া পড়িয়াছে। নহিলে এতবড় রাজ্যের একটা সেনাপতি হইয়া, সে এতটা নির্ব্বোধের মত কাজ করিবে কেন?

সত্যসত্যই অতি দুঃসাহসে ভর করিয়া শাহজাদা সেদিন শত্রু-শিবিরে গিয়াছিলেন। এটুকু তিনি মনে স্থির জানিতেন, যখন সম্রাটের দূতরূপে তিনি এই মীরণশার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন, তখন পাঠান রাজ্যের শেষ সীমা পর্য্যন্ত তিনি নিরাপদ। কেহই তাঁহাকে আটক কবিতে পারিবে না।

তবুও একটা অতিরিক্ত সুবিবেচনার বশে, তিনি পঞ্চাশৎ মোগল সেনা, এই পথের নিকটস্থ এক জঙ্গলে লুকাইয়া রাখিয়া, মীরাণশার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান।

যেভাবে তিনি ছদ্মবেশ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা সহজে ধরিবার কোন উপায় ছিল না। কেন না—উৎক্রোশদৃষ্টিসম্পন্ন মীরাণশা, তাহা হইলে তাঁহাকে দেখিবামাত্রই চিনিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি তাহা পারেন নাই, আর কুমার দানিয়েল ঘটনাবশে বাধ্য হইয়াই, আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন।

শিবিরে সমাগত হইয়া, কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর শাহজাদা,

তাঁহার সমীপবর্ত্তী এক প্রহরীকে আদেশ করিলেন,—"সম্শের খাঁকে বল, সে যেন বন্দী পাঠান সেনাপতিকে এখানে এখনিই উপস্থিত করে।"

কিয়ৎক্ষণ পরে মোগল সেনাধ্যক্ষ সম্শের খাঁ, আফ্শানকে শাহজাদার সম্মুখে উপস্থিত করিল।

শাহজাদা কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া আফ্শানের আপাদমস্তক লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"পাঠান সেনাপতি! কি উদ্দেশ্য লইয়া তুমি আমার অনুসরণ করিয়াছিলে?"

আফশান। তাহা যদি না বলি শাহজাদা?

শাহজাদা। আমি তোমায় বলিতে বাধ্য করিব। তাহার অনেক উপায় এ শিবিরে আছে। আমি পাঠান মুলুক জয় করিতে আসিয়াছি। তোমার মত একজন পাঠানকে সায়েস্তা করিবার ক্ষমতা যে এখানে আমার খুব বেশী, তাহা বোধ হয় তোমাকে কষ্ট স্বীকার করিয়া বুঝাইতে হইবে না।

এই কথা বলিয়াই শাহজাদা সম্শের খাঁকে আদেশ করিলেন,—"জহ্লাদকে ডাক।"

আদেশপ্রাপ্তি মাত্রেই সম্শের সে স্থান ত্যাগ করিল। পরক্ষণেই এক ভীমকায় বিকটদর্শন কাফ্রিকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল।

শাহজাদা কৃত্রিম কোপের সহিত সেই খোজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"ইয়াদ রসুল! এই শয়তানের গায়ের কাপড় খুলিয়া লইয়া পঁচিশ বেত্রাঘাত কর। ক্ষতস্থান হইতে রক্ত বাহির

হইলে, তাহাতে নিমকের ছিটা লাগাইয়া দাও। তাহা হইলেই এই শয়তানের চৈতন্য হইবে।"

আফশান অতি সাহসী বীর পুরুষ। কিন্তু সে দেখিল, এই মোগল শাহজাদা পাঠানের অপেক্ষা পাষাণ ও নিষ্ঠুর!

অগত্যা অবস্থাভিজ্ঞ আফশান বলিল,—"আমায় কি জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করেন—বলুন।"

শাহজাদা। তুমি কেন আমার অনুসরণ করিয়াছিলে?

আফশান। প্রতিশোধ লইবার জন্য।

শাহজাদা। এ প্রতিশোধ লইবার কারণ কি?

আফশান। তাহা নাই বা বলিলাম!

শাহজাদা মৃদুহাস্যের সহিত বলিলেন,—"পঁচিশ কোড়া পিঠে না পড়ার পূর্ব্বেই যখন এতটা ফল হইয়াছে, তখন কোড়া পড়িলে তোমার নিকট হয় ত আরও অনেক কথা জানিতে পারিব।"

আফশান ক্রুদ্ধভাবে ভ্রুকুটীভঙ্গী করিয়া বলিল,—"আর কি কথা জানতে চান আপনি?"

শাহজাদা। তোমার সহিত আফ্‌জাই দুর্গাধিপতি মীরাণ শার সম্বন্ধ কি?

আফশান। আমি তাঁর প্রধান সেনাপতি।

শাহজাদা। ওঃ! তুমিই সেই আফশান খাঁ? ভাল! তোমাকে দেখিয়া একটু খুসী হইলাম। তোমাকে বন্দী করিয়া আরও একটু আনন্দ পাইলাম। একটা কথা জানিতে চাই, তোমরা যে মোগলের সঙ্গে লড়িবে, তোমাদের সেনা সংখ্যা কত?

আফশান। সেনা সংখ্যা অবশ্য মোগলের সমান না হইতে পারে, কিন্তু আমাদের জন্মভূমির চারিধার ঘেরা, প্রবল দুর্ভেদ্য পাহাড়দুর্গ, আমাদের প্রধান সহায়!

শাহজাদা। ঐ সব পাহাড় যদি আমরা দখল করি!

আফশান। অসম্ভব! উপরে উঠিবার দুইটী মাত্র গুপ্তপথ আছে। সে পথ না জানিলে—মৃত্যুকে সম্মুখে রাখিয়া, পাহাড়ে উঠিতে হইবে। গতবারে তার্দ্দিবেগের কি দুর্দ্দশা হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় আপনি না শুনিয়া এখানে আসেন নাই!

শাহজাদা। আমরা এই দুইটি গুপ্তপথের আগে সন্ধান করিব।

আফশান। কিরূপে?

শাহজাদা। তোমারই সহায়তায়!

আফশান। পাঠান দেশদ্রোহী হইতে শিখে নাই—পাঠান বিশ্বাসঘাতকতা করিতে জানে না।

শাহজাদা। হইতে পারে। কিন্তু আমরা তোমাকে এই গুপ্তপথ দুটি দেখাইতে বাধ্য করিব।

আফশান। আমার দেহে জীবন থাকিতে হইবে না।

শাহজাদা। যাহাতে হয়, তাহার উপায়ও আমরা জানি। আমি তোমাকে এই আফজাই রাজ্যের শাসনকর্ত্তার পদ দিব। পঞ্চাশ হাজার আসরফি তোমার পুরস্কার। তুমি আমাদের সহায়তা কর।

আফশান কঠোরহাস্যের সহিত বিদ্রূপসূচক স্বরে বলিল,—"শাহজাদা! পাঠানসম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতা খুবই কম

দেখিতেছি। অথচ এই পাঠানকে আপনি পরাজয় করিতে আসিয়াছেন। মোগল বাদসাহের দিল্লী ও আগরার সমগ্র রাজকোষের বিনিময়ে; আমার কথা ছাড়িয়া দিন—অতি দরিদ্র কোন পাঠানও, আপনার এ ঘৃণিত প্রস্তাবে সম্মত হইবে না।"

"ভাল—কার্য্যক্ষেত্রে এ বিষয়ের মীমাংসা করিব।" এই কথা বলিয়া শাহজাদা সমশের খাঁকে বলিলেন—"এই পাঠানকে অতি সতর্কতার সহিত আজ রাত্রের জন্য, শিবিরমধ্যস্থ কারাগারে রাখিয়া দাও। কাল প্রভাতে ইহাকে লাহোর-দুর্গে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিব। সেখানে বাদশাহের বিচারে যাহা হয় হইবে।"

সমশের "যো হুকুম" বলিয়া একটা কুর্ণীস করিল। তাহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া শাহজাদা বলিলেন,—"দাড়াও সমশের!"

সমশের আবার একটা কুর্ণীস করিয়া বলিল,—"হুকুম করুন।"

শাহজাদা মৃদুহাস্যের সহিত বলিলেন,—"আর যে দশজন পাঠান এর সঙ্গে বন্দী হইয়াছে, তাহাদের একজনকে মাত্র মুক্ত করিয়া দাও। সে আফজাই বাদশাকে খপর দিক—যে তাহাদের প্রধান সেনাপতি আফ্‌শান খাঁ মোগল-শিবিরে বন্দী রহিয়াছে। লাহোর দুর্গে পাঠাইবার পরদিনেই তাহার শিরশ্ছেদ করা হইবে।"

সমশের একটি কুর্ণীস করিয়া, আফ্‌শানকে সঙ্গে লইয়া সে স্থান ত্যাগ করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

মোগল শিবিরের বন্দীত্বমুক্ত সেই পাঠান সৈনিক, আফ্জাই রাজপ্রাসাদে পৌছিয়াই, আফ্শানের সসৈন্যে বন্দী হওয়ার কথা মীরণশাকে জানাইল।

আফ্শান কেন যে দশজন পাঠান সেনা লইয়া মোগল শাহজাদার পশ্চাদানুসরণ করিয়াছিল, তাহার কারণ তিনি কিছুই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেন না। কেন না তিনি নিজে তাহাকে এ সম্বন্ধে কোন হুকুম প্রদান করেন নাই।

মোগলসৈন্য পুরী আক্রমণ করিবার জন্য অতি নিকটে থাকিয়া সুযোগ অপেক্ষা করিতেছে, আর এই সময়ে সমবেত পাঠান সৈন্যের একমাত্র অধিনায়ক আফ্শান শত্রুহস্তে বন্দী, এ চিন্তা মুহূর্ত্তমধ্যে মীরণশাকে ক্ষিপ্তপ্রায় করিয়া তুলিল।

সেনা পাঠাইয়া আফশানকে উদ্ধার করা, সেও এখন অসম্ভব ব্যাপার। মোগল-সেনা, এবার অসংখ্য তোপ আনিয়াছে, পাহাড়ের উপর হইতে সদলবলে নামিয়া মোগলের অব্যর্থ তোপের মুখ এড়াইয়া তাহাদের আক্রমণ করা, বড় সহজ কাজ নয়। তাহাতে কেবল অসংখ্য সৈন্য ক্ষয় ভিন্ন, আর কিছুই ফল হইবে না। আর পাঠান সেনা আক্রমণ করিবার পূর্ব্বেই হয় ত মোগলেরা আফ্শানকে হত্যা করিয়া ফেলিবে।

মীরাণশা, সেই সেনানীকে প্রশ্ন করিলেন,—"সেই নির্ব্বোধ আফশান খাঁ, তোকে কিছু বলিয়া দিয়াছে কি ?"

সেনানী। কিছুই না, জনাব! আসিবার সময় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের কোন উপায় ছিল না। তাঁহাকে মোগলেরা যে কোথায় বন্দী করিয়া রাখিয়াছে—তাহা জানিবার কোন সম্ভাবনাই নাই।

মীরণশা, ওষ্ঠাধর দংশন করিয়া বিরক্তিসূচক স্বরে বলিলেন,—"মোগল শাহজাদা কোন পত্র বা সংবাদ, তোর মারফৎ পাঠাইয়াছেন ?"

সেই সৈনিক একখানি পত্র তাহার আঙ্গরাখার মধ্য হইতে বাহির করিয়া, কম্পিতহস্তে মীরণশার হাতে দিয়া বলিল,—"জনাব! এ বান্দারগোস্তাখি মাফ্ করিবেন। অত্যন্ত উত্তেজনার ফলে আমি এ পত্রখানির কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম।"

"তুই বাহিরে অপেক্ষা কর। আমার হুকুম না পাওয়া পর্য্যন্ত চলিয়া যাইবি না।" এই কথা বলিয়া মীরাণশা শীলমোহরাঙ্কিত শাহজাদার পত্রখানি, কম্পিত হস্তে গ্রহণ করিয়া তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন।

তাহাতে লেখাছিল—"জনাবের সহিত আজ আমার যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা আপনার সুযোগ্য অতি সতর্ক সেনাপতি, আফশান খাঁ গোপনে থাকিয়া সবই শুনিয়াছিল। এ কথা সে আমার নিকট স্বীকার করিয়াছে। আপনার কন্যা পান্না বেগমের নামোল্লেখ শুনিয়াই, সে বিশ্বাসের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া

আমাদের সকল কথা শেষ পর্য্যন্ত শুনিয়া, দশজন সৈন্য লইয়া পথিমধ্যে আমাকে বন্দী করিবার চেষ্টা করে। তাহার পরিণামে সে আমাদের হস্তেই বন্দী হইয়াছে। রাজনীতির পবিত্র বিধান, যাহা আপনি লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই, তাহা আপনার গোলামের গোলাম, অতি হীনপ্রকৃতির এই আফ্‌শান খাঁই করিয়াছে। আমি যতটুকু জানিতে পারিয়াছি, আমাকে হত্যা করিয়া, আপনার কন্যাকে লাভ করার পথ পরিষ্কার করাই তাহার মনের প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য। আমি আফ্‌শানের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছি। কাল তাহাকে বন্দী অবস্থায় লাহোর দুর্গে পাঠান হইবে। সন্ধিসম্বন্ধে আমি যে প্রস্তাব করিয়াছি, তাহাতে যদি আপনি স্বীকৃত হন, তাহা হইলে কল্য প্রভাতের পরই আমাকে সংবাদ দিবেন। নচেৎ এই শয়তান আফ্‌শানের শোচনীয় মৃত্যু অনিবার্য্য! আর আফ্‌শানকে হত্যা করিয়াই মোগলসৈন্য সুযোগ বুঝিয়া আপনার রাজ্য আক্রমণ করিবে।
"শাহজাদা দানিয়েল।"

পত্রখানি পাঠ করিবার পর মীরাণশার মুখমণ্ডল, ভয়ে, লজ্জায় ঘৃণায় ও উৎকণ্ঠায় আরক্তভাব ধারণ করিল। আফ্‌শান নিব্বুদ্ধিতা করিয়া কেবল যে তাহার নিজের বিপদ ঘটাইয়াছে, তাহা নয়। সমগ্র পাঠানরাজ্য, আজ তাহার বুদ্ধির দোষে বিপন্ন।

মীরাণ শা, এদানীং আফ্‌শানের উপর মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। শাহজাদা যে রাত্রে পলায়ন করেন, সে রাত্রের সমস্ত ঘটনা, তিনি হিম্মত খাঁর নিকট

অবগত হন। হিম্মত—কে জানে কি কারণে, আফ্‌শানকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিত না। তবে—এ বিরক্তির ভাবটা সে মনের ভিতর খুব নিভৃতে লুকাইয়া রাখিত।

শাহজাদা তাঁহার পত্রে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহা যে একটা অতিরঞ্জিত বর্ণনা নয়, পান্নাকে নিরাপদে লাভ করিবার জন্যই, যে আফ্‌শান শাহজাদাকে গোপনে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, এ কথাটা তাঁহার মনে খুবই জাঁকিয়া বসিল। আফ্‌শানের উপর, তাঁহার তখনও যে অল্প মাত্র স্নেহ ও আকর্ষণ ছিল, তাহার এই দ্বিতীয় অপরাধের মুখে সে টুকুও নষ্ট হইল।

মীরাণশাহ, সর্দ্দারদের তখনই তলব করিয়া পাঠাইলেন। মোগল রাজপুত্রের আগমন ব্যাপার হইতে, আফ্‌শানের মোগল হস্তে বন্দী হওয়ার সম্বন্ধে, সব কথাই তাঁহাদের খুলিয়া বলিলেন। সর্দ্দারেরা সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া, স্তম্ভিত ও বিস্ময়বিমুগ্ধ।

সকলেই মৌনভাবে নির্ব্বাক অবস্থায় ঘটনাটা ভাবিতেছেন, আর আফশানকে তাহার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য মনে মনে শত শত অভিসম্পাত দিতেছেন—এমন সময়ে সহসা মৌন ভঙ্গ করিয়া মীরাণশা বলিলেন—"এই বিপদের সময়, প্রকৃত কর্ত্তব্য যে কি তাহা আমি ঠিক করিতে পারিতেছি না। দেখিতেছি, দীন্-দুনিয়ার পয়দাকর্ত্তা যিনি—তিনি আমাদের উপর খুবই নারাজ। তাহা না হইলে এ যুদ্ধের যে প্রধান সেনাপতি—তাহার এ বালকোচিত চাঞ্চল্য ঘটিবে কেন? তুচ্ছ স্বার্থের জন্য সে, নিজের সর্ব্বনাশ, এ রাজ্যের সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টা করিবে কেন?"

সর্দ্দারদের মধ্যে সকলেই বয়োবৃদ্ধ, পক্ককেশ ও অবস্থাভিজ্ঞ। কিন্তু এ সংকটক্ষেত্রের উপস্থিত কর্ত্তব্য যে কি, তাহা স্থির করিতে তাঁহারা সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া পড়িলেন।

সর্ব্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ সর্দ্দার, রসুল খাঁ বলিলেন—"এ ক্ষেত্রে মোগলের সহিত সন্ধি করাই শ্রেয়ঃ! আপনার স্বাধীন মত কি নবাব সাহেব?"

মীরাণশার চক্ষু দুটি ক্ষণমাত্র বাঘের মত জ্বলিয়া উঠিল। সেই প্রবীণ বার্দ্ধক্যে, তাঁহার মুখে যেন যৌবনের তেজ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি কঠোরস্বরে বলিলেন—"জীবন ও সাম্রাজ্য, খোদার এ দুনিয়ায়, দুদিনের লীলা খেলা মাত্র। আজ যে আমীর সে কাল ফকির। আমিও চিরদিন থাকিব না, আপনারাও না—আর যে আকবর-শাহ সৈন্য পাঠাইয়া, আমাদের এই সুখের রাজ্যকে ধ্বংশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তিনিও না! অটল—অবিনশ্বর অবস্থায় থাকিবে কেবল—যশ ও মান। কন্যাদানে, নিজের ও রাজ্যের স্বাধীনতা বিক্রয়ে, ছার জীবন রক্ষা আমি মহাপাপ বলিয়া গণ্য করি। আমাদের এই হীন ব্যবস্থা, অক্ষমতা ও বিবেচনার দোষে, যদি এই চিরগর্ব্বোন্নত শীর্ষ আফজাই দুর্গপ্রাকারে চিরদিনের জন্য মোগলের রক্ত পতাকা উড্ডীয়মান হয়,—সে কলঙ্ক যে যুগযুগান্তরেও মুছিবে না। শুনুন পাঠান সর্দ্দারগণ! আমি মোগল রাজপুত্রকে কন্যাদানও করিব না, নিজের এ ছার জীবনের বিনিময়ে অসংখ্য প্রজা-বর্গেরও সর্ব্বনাশ করিতেও পারিব না। আজ দরবার ভঙ্গ

হউক। কাল প্রভাতে আপনারা যুদ্ধসম্বন্ধে আমার শেষ মত জানিতে পারিবেন।"

আর কিছু না বলিয়া, উন্মাদের মত বিকট দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে একবার চাহিয়া, দুর্গাধিপতি মীরণশা, সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন। সর্দ্দারেরা মীরাণশার এই অবস্থা দেখিয়া বুঝিলেন—ইহা মহা ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষণ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে পান্না ও মুনিয়া, দুইজনে মর্ম্মর মেঝের উপর বিছানো, এক মছলন্দের বিছানায় বসিয়া গল্প করিতেছিল। কিন্তু পান্না সে গল্পটা ঠিক শুনিতেছিল কিনা, বলিতে পারি না।

এমন সময়ে হিম্মত খাঁ সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল—"পান্না বেগম! আজ তোমার জন্য একটা খুব তাজ্জব খবর অনিয়াছি ?"

পান্না গ্রীবা ফিরাইয়া, হিম্মতের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি খবর হিম্মত ?"

হিম্মত গম্ভীর মুখে বলিল—"আমাদের সেনাপতি আফ্শান খাঁ মোগলের হস্তে বন্দী!"

পান্না। সে কি ?

হিম্মত। এ পর্য্যন্ত এই আফ্শান খাঁকে আমরা খুব হুঁসিয়ার

বলিয়াই জানিতাম। সে দেখিতে যেমন জঙ্গী-জোয়ান, বুদ্ধিটাও সেইরূপ তীক্ষ্ণ—এই ধারণটা আমার ছিল। এখন বুঝিতেছি—আফজাই রাজ্যের মধ্যে, তাহার মত নির্ব্বোধ আর দ্বিতীয় আদমি নাই।"

পান্না। সে এমন কি কাজ করিল—যে তাহাকে তুমি এতটা নির্ব্বোধ ঠাওরাইতেছ?

হিম্মত তখন আফ্‌শান সম্বন্ধে সমস্ত কথা পান্নাকে খুলিয়া বলিল। বলা বাহুল্য, একটু পূর্ব্বে হিম্মত তাহার প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া সেই মুক্তিপ্রাপ্ত পাঠান-প্রহরীকে দেখিতে পায়। এই প্রহরীর চাকরী, এই হিম্মতই করিয়া দিয়াছিল। সেই প্রহরী তাহার মুরুব্বি ভাবিয়া হিম্মতকে খুব খাতির করিত। এজন্য সেই তাহাকে গোপনে সমস্ত ঘটনা বলিয়া ফেলিয়াছে।

এই সংবাদ সংগ্রহের পর, হিম্মত মীরাণশার কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিল—সর্দ্দারদের সন্নিকট মীরাণশা কি একখানি গোপনীয় চিঠি পড়িতেছেন। সে প্রচ্ছন্নভাবে, পার্শ্ববর্ত্তী এক কক্ষে থাকিয়া চিঠিতে লেখা সমস্ত ঘটনাই শুনিল। আর সেই সংবাদ, পান্নাকে সবিস্তারে জানাইবার জন্য, সে পান্নার কক্ষে অযাচিতভাবে প্রবেশ করিয়া, সব কথা তাহাকে এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিল।

ব্যাপার শুনিয়া পান্নার মুখ শুখাইল। বুকের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল। সে দেখিল, তাহাদের নসীব যেন ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। আর যে আফ্‌শান খাঁ, এক দিন তাহাকে এই

নসীবের প্রাধান্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে আসিয়াছিল, সেই তাহার অবিবেচনাময় কার্য্যদোষে তাহাদের নসীব চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে।

ধরিতে গেলে, হিম্মত অজ্ঞাতসারে পান্নার মনে একটা আগুণ ধরাইয়া দিয়া, সেই কক্ষত্যাগ করিল। পান্না সেই আগুণে জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইতে লাগিল। হিম্মত—আফ্‌শানের উপর চিরদিনই বিরক্ত। তাহার এই শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া হিম্মত একটু আনন্দ পাইয়াছিল। আর সেই আনন্দের অংশ পান্নাকে দিতে আসিয়া, তাহার সর্ব্বাঙ্গে তুষানলের জ্বালা ছড়াইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

পান্না—তাহার প্রিয় সঙ্গিনী মুনিয়ার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ছলছলনেত্রে বলিল—"কি উপায় হবে তা হ'লে আমাদের মুন্না?"

মুন্না বিমর্ষমুখে বলিল—"কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না। ভয়ানক ব্যাপার ঘটিল দেখিতেছি। আফ্‌শান নাই যুদ্ধ চলিবে কি করিয়া? এ দিকে শুনিতেছি তোমার পিতা সন্ধি করিতে একাবারে অনিচ্ছুক।"

পান্না মনে মনে আফ্‌শানকে তাহার এই সাংঘাতিক নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য অসংখ্য অনুযোগ করিল। কিন্তু সে অনুযোগ শুনে কে?

তাহার মনের অবস্থা তখন এত ভয়ানক, যে মানুষের নিশ্বাসটী পর্য্যন্ত যেন তাহার গায়ে অনলকণা বর্ষণ করিতেছে। মুন্না তাহার একমাত্র সখি-সঙ্গিনী ও সচিব। এই মুন্নার উপরও যেন তখন

সে বিরক্ত হইয়া উঠিল। তাহার সাহচর্য্যের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত, যেন তাহার পক্ষে অতি দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

পান্নার হৃদয়ের মধ্যে মহা-ঝড় উঠিয়াছে বলিয়া, রাত্রি সে জন্য অপেক্ষা করিবে কেন? সুতরাং দিবাবসানের পর রাত্রি আসিল। রাত্রিতে যেন পান্নার প্রাণের যন্ত্রণাটা বড়ই বাড়িয়া উঠিল। সে যেন খুবই নির্জ্জনতা প্রয়াসী হইয়া পড়িল।

সে মুন্নাকে বলিল—"মুনিয়া! আজ তুই নিজের কক্ষে গিয়া শুইবি। রাত্রে এখানে আর তোর আসিবার প্রয়োজন নাই। আমাকে এই ব্যাপারগুলি নির্জ্জনে একটু চিন্তা করিতে দে।"

মুন্না সব কথা সোজাসুজিই বুঝিল। সে বলিল—"ভাল তাহাই হউক! তুমি যাহাতে স্বচ্ছন্দে থাক, তাহাতে বাধা দিতে আমি চাই না।"

মুন্না বলিল—"তোমার খাবার যথাস্থানে রাখিয়া গেলাম। ঠিক সময়েই খাইও।" এই কথা বলিয়া সে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

পান্না তাহার কক্ষে একা। অংসখ্য দীপাধারে উজ্জ্বল দীপ জ্বলিতেছে। বায়ুভরে দীপশিখা কখনও বা কাঁপিতেছে কখনও বা স্থিরভাবে দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে।

পান্নার হৃদয়ে যেন আশীবিষদংশনের জ্বালা উপস্থিত হইল। একান্ত নির্জ্জনতা তাহার জ্বালাময়ী চিন্তার মুখে নূতন ইন্ধন জোগাইয়া দিল। সে এ দুনিয়ায় চিরদিনই জ্বলিতে আসিয়াছে সুতরাং জ্বলিতেই লাগিল।

কক্ষ-মধ্যস্থ বায়ু বড়ই সন্তাপ পরিপূর্ণ। প্রাণের জ্বালা যদি মুক্ত বায়ুতে শান্ত হয় ভাবিয়া, সে বাতায়ন পথে আসিয়া দাঁড়াইল।

অসীম মুক্ত আকাশের বুকে, কোটি কোটি তারকা ছড়ানো। গায়ে মেঘ জড়ানো। বায়ুভরে সেই শুভ্রতুলারশিবৎ মেঘখণ্ড হেলিতেছে—দুলিতেছে—ছুটিতেছে—কাঁপিতেছে। কখনও বা কৃষ্ণপঞ্চমীর ক্ষীণ চন্দ্রকে আবরিত করিতেছে, কখনও বা মুক্ত করিয়া দিতেছে।

এক দৃষ্টে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিয়া—পান্না অস্ফুট স্বরে বলিল—"হায়! আমি অভাগিনীই ত' যত অনর্থের মূল। আমিই ত শান্তিময় কক্ষের মধ্যে অশান্তির কাল ছায়া আনিয়াছি। আমি যদি শাহজাদাকে মুক্তি দিবার জন্য এত কাণ্ড না করিতাম, তাহা হইলে ত আজ এ সব ঘটিত না। আমি যদি সেই শয়তান অপদার্থ আফ্‌শানকে এতটা প্রশ্রয় না দিতাম, তাহাহইলে ত সে আমাকে পাইবার জন্য এরূপ একটা দুরূহ সংকল্প করিয়া বিপদে পড়িত না।"

যে আমার অপরিচিত, যাহার সহিত কোন সম্পর্ক্য নাই, পাঠানের চিরশত্রু, সেই মোগল শাহজাদা সে আমার কে? কেন তাহার উদ্ধারের জন্য আমি এত কাণ্ড করিলাম? কে আমায় বুঝাইয়া দিবে—তাহার উপর আমার এতটা মমতা, এতটা আকর্ষণ, এতটা সহানুভূতি জন্মিল।

তবুও বুঝিতেছি,অন্তরে বাহিরে যে সে আমার। নয়নে মরমে

সে যে সর্ব্বদা বিরাজিত। চক্ষু চাহিলে দেখি, সে আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মৃদু হাস্য করিতেছে। চক্ষু মুদিলে দেখি, আমার অন্তরে যাহা কিছু ঐশর্য্য গরিমা ছিল—সব সরাইয়া দিয়া সে যে রাজরাজেশ্বর রূপে তথায় বিরাজ করিতেছে! এ কি জ্বালা, কি মোহ, কি আত্মবিড়ম্বনা, আমার ঘটিল!

কোথায় তুমি সৌম্য, দয়িত, কান্ত, রাজরাজ্যেশ্বর! একবার আসিয়া আমায় দেখা দাও। একবার বলিয়া যাও, কি করিলে আমার পিতার মান-সম্ভ্রম-শৌর্য্য-গৌরব সব বজায় থাকে! কি করিলে সকল দিক রক্ষা হয়! এখন তুমি ক্ষমতার অধিপতি, ঘটনাচক্রে আমরা তোমার আশ্রয় ভিখারী। আমাদের মান সম্ভ্রম রক্ষা কর।"

পান্না আর বলিতে পারিল না। চোখের জলে তাহার বুক ভাসিয়া গেল। তাহার চিন্তাবিদলিত, কোমল প্রাণে আরও নূতন ভয়, নূতন বিভীষিকা ফুটিয়া উঠিল। সে চক্ষু মুছিয়া, সেই বাতায়ন নিম্নে বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া যুক্তকরে বলিল - "মেহেরবান—খোদা! এই দীন্—দুনিয়ার পয়দাকর্ত্তা খোদা! আমার পিতাকে বাচাও। তাঁহাকে বিপন্মুক্ত কর। এই প্রচণ্ড কল্লোলময় বিশাল সংসার সমুদ্রে ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদ্ আমি। আমার ক্ষুদ্র অস্তিত্ব মুছিয়া দিলে যদি আমার পিতা রক্ষা পান্, তাহারই ব্যবস্থা করিয়া দাও প্রভু!"

পান্না, বাতায়নপথ ত্যাগ করিয়া শয্যায় আসিয়া শুইল। সে শয্যা যেন কণ্টকাকীর্ণ। প্রত্যেক পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনে

যেন সূচিকাবেধের তীব্র যাতনা। সে আবার চঞ্চল চিত্তে শয্যাত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত বাতায়ন পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন চাঁদ ডুবিয়াছে—আর ইতঃস্তত ভ্রাম্যমান মেঘের কোলে কোটি কোটি তারকা যেন তাহার দুঃখ দেখিয়া হাসিতেছে।

বাতায়ন পথে দাড়াইয়া, পান্না গম্ভীরা নৈশপ্রকৃতির নিশীথ স্নিগ্ধ সমীরেও প্রাণের শান্তি পাইল না। বাতায়ন নিম্নেই একটী জাফ্রান ক্ষেত্র ছিল। সেখান হইতে মনোমদ সুগন্ধ চুরী করিয়া আনিয়া, নৈশ বায়ু তাহার নাসাপুটে পৌছাইয়া দিতেছে। তবুও সে সুগন্ধে তাহার তৃপ্তি নাই। তখন নিশীথের মধ্য যাম অতীত হইয়া গিয়াছে। চাঁদ ডুবিয়া যাওয়ায় সেই উপত্যকার বুকে যেন মৃত্যুর মলিনছায়া পড়িয়াছে।

প্রাণের জ্বালায় শ্রুতিবোধ্য স্বরে পান্না বলিল,—"আমি যদি মরি, তাহা হইলে ত সকল জ্বালাই ফুরাইয়া যায়। সন্ধির পণ্যদ্রব্যরূপে আমাকেও বিক্রীত হইতে হয় না—আফ্‌গানও মুক্তি পায়, আমার পিতার সাম্রাজ্যও ধ্বংশমুখ হইতে বাচিয়া যায়। হায়! হায়! এ সর্ব্বজ্বালাশান্তিকর সর্ব্ব আপদ নিপাতকারী মৃত্যুর পথ আমায় কে বলিয়া দিবে? কে আমাকে এই ইপ্সিত মৃত্যু আনিয়া দিবে?"

সহসা কে যেন একজন তাহার পশ্চাৎ হইতে পরুষকণ্ঠে তাহার কথাব তীব্র প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল,—"ভাবিতেছ—তুমি পান্না! মৃত্যু তোমায় কে আনিয়া দিবে? আমি দিব! দিব কি—দিতেই আসিয়াছি।"

পান্না সেই অতি কঠোর, তীব্র পরুষস্বরে, ভয়চকিতা হরিণীর মত বাতায়ন পথ হইতে সরিয়া আসিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল,—"কে তুমি? কে তুমি? যে আমায় আমাকে ইঙ্গিত মৃত্যু দিতে আসিয়াছ?"

যে আসিয়াছিল—তাহার আপাদমস্তক একখানি কৃষ্ণ আবরণাবৃত। তাহার মুখখানি পর্য্যন্ত দেখিবার উপায় নাই।

পান্না আবার চকিতনেত্রে চাহিয়া সভয়চিত্তে বলিল,—"কে তুমি"?

সেই আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত মূর্ত্তি তাহার মুখের আবরণ খুলিয়া, আবার ভীতিসঞ্চারক কণ্ঠে বলিল,—"আমায় চিনিতে পারিতেছ না পান্না? আমি মীরণশা—এই আফ্‌জাই জাতির একচ্ছত্র বাদশা—তোমার পিতা!"

পান্না সভয়ে, সচকিতে একবার পিতার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—"পিতা! তুমি! আমায় হত্যা করিবে? যে ক্ষুদ্র লতিকাটীকে এতদিন এত যত্নে, এত চেষ্টায়, এত বড় করিলে—আজ তাহাকে জন্মের মত ছিঁড়িয়া ফেলিবে? কেন—কেন—পিতা! কি অপরাধ করিয়াছি আমি?"

আবার সেই স্নেহরসবিপ্লুত—চিরদিনশ্রুত, মোহমায়ামাখা সোহাগপুষ্ট পিতৃ সম্বোধন!

মীরাণশা তাঁহার কম্পিত হস্তধৃত শাণিত ছুরিকাখানি, কোষ মধ্যস্থ করিয়া বলিলেন,—"পান্না—পান্নামতি! মা আমার! মরিতে চাহিতেছিলে কেন?"

পান্না এ স্নেহময় সম্বোধনে সাহস পাইয়া পিতার, সন্নিকটস্থ হইয়া তাঁহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিল,—"অনেক দুঃখ আমার বাবা! অনেক জ্বালা আমার বাবা! মার কাছে যাইতে বড় ইচ্ছা হইয়াছে, তাই মৃত্যু কামনা করিতেছিলাম।"

মীরাণশা উন্মাদের ন্যায় বিকট দৃষ্টিতে পান্নার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"পান্না! পান্না! দোহাই খোদার! সত্য বল—তোর এ জ্বালা কি আমি তোকে দিয়াছি? মনে কর তোর মাতার সেই মৃত্যু দিন! সে দিন কত তুষারবৃষ্টি—কত ভীষণ ঝটিকা। প্রকৃতি রণোন্মাদিনী। বাহিরে যেমন ঝড়, আমার অন্তরেও তেমনি ঝড। সম্মুখে পড়িয়া আমার প্রাণাধিকা পত্নী—তোর রাজরাজেশ্বরী মাতা, শ্বাস টানিতেছে—তুই মা-মা করিয়া কাঁদিতেছিস্। বাহিরে উন্মাদ সমীরণের প্রচণ্ড হা-হা ধ্বনি, আর আমার মুখে হায়—হায় শব্দ!"

পান্না সভয়ে দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। মাটিতে বসিয়া পড়িয়া যুক্তকরে বলিল,—"পিতা! পিতা! অত নিষ্ঠুর হইও না। সে ভীষণ দিনের স্মৃতি আর জাগাইয়া তুলিও না। স্থির হও—তোমার ইপ্সিত কার্য্য শেষ করিয়া চলিয়া যাও। আমি মরিলে তোমার সকল জ্বালা জুড়াইবে।"

মীরাণশা অপেক্ষাকৃত স্থিরভাব অবলম্বন করিয়া বলিলেন, "না—না আর তোর মা'র কথা বলিব না। এ বিষাদময় স্মৃতি জাগাইবার কোন প্রয়োজন ছিল না, কেবল একবার মাত্র তোকে তোর মার সেই শেষ কথাগুলি স্মরণ করাইয়া দিবার

জন্য। মনে পড়ে কি পান্নামতি! তোর মা তাহার শোণিত-হীন বিশীর্ণ পাণ্ডুবর্ণ দক্ষিণ হস্তখানি দিয়া, তোর সুকোমল হাতখানি ধরিয়া, আমার হাতে সঁপিয়া দিয়া, তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে আমাকে শেষ অনুরোধ করিয়াছিল—"আর সংসার করিও না। আমার পবিত্র স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এই পান্নাকে তোমার হাতে দিয়া গেলাম। এই পান্নাই তোমার ধর্ম্ম—কর্ম্ম, কর্ত্তব্য—রাজকার্য্য। ইহাকে যত্নে পালন করিও, চিরদিন স্নেহ করিও, সুপাত্রে অর্পণ করিয়া—রাজ্যেশ্বরী করিয়া দিও। তবে যদি কখন দেখ স্বামি—এই পান্না ইচ্ছা করিয়া তোমার কষ্টের কারণ হইয়াছে, তাহা হইলে তাহাকে স্বহস্তে নষ্ট করিও।" পান্না! তুই এখন আমার সমূহ কষ্টের কারণ। তোর জন্য আমার রাজধর্ম্ম, প্রজার প্রতি কর্ত্তব্য, রাজ্যের প্রতি কর্ত্তব্য, মনের সুখ শান্তি, সবই নষ্ট হইতে বসিয়াছে! তাই তোর মাতার আদেশে তোকে হত্যা করিতে আসিয়াছি।"

অনুতাপের আগুণ যেন পান্নার বুকে পাঁজার তীব্র আগুণের মত জ্বলিতেছিল। সে অতীত কথাগুলি ত্বরিতে একবার ভাবিয়া লইয়া বুঝিল—সত্যই তাহার কার্য্য দোষে তাহার পিতার রাজ্য বিপন্ন, সম্মান বিপন্ন, আর সেই সঙ্গে সে নিজেও বিপন্ন।

পান্না মনে মনে কি ভাবিয়া বলিল,—"ভালই হইয়াছে। যাঁহা হইতে এ ছার দেহের উদ্ভব, তিনিই আমায় বিনাশ করিতে আসিয়াছেন। যাঁহা হইতে জগতের বুকে প্রথম আলোক দেখিয়াছিলাম, তিনি আমায় চিরদিনের মত এক চিরান্ধকারময়

মৃত্যুর রাজ্যে প্রেরণ করিতেছেন। এর চেয়ে সুখের কথা, শান্তির কথা, আর কি আছে পিতা? আপনার শাণিত ছুরিকা আবার কোষমুক্ত করুন—আমার এই বক্ষে বিঁধিয়া দিন। আমার হৃদয়ের শোণিত উৎসধারায় আপনার চরণ দুটি ধোয়াইয়া দিক্—আমিও ধন্যা হই। আমার সকল যন্ত্রণার অবসান হইয়া যাক।"

পান্নার আরক্ত গণ্ডদেশ বহিয়া মুক্তাবিন্দুবৎ অশ্রুধারা বহিল। সে অশ্রুধারা যেন বর্ষার নদীর বাণের মত। মহা-শক্তিতে সেই তীব্র তরঙ্গ আসিয়া মীরাণশার হৃদয়ের রুদ্ধ কপাট দ্বারে প্রচণ্ডবেগে আঘাত করিল। অশ্রুজলের শক্তির নিকট তিনি আবার পরাজিত হইলেন।

মীরাণশা তাঁহার কোষমুক্ত ছুরিকাখানি সেই কক্ষ মধ্যে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন,—"না—না পারিলাম না। যাহা সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা ধ্বংশ করিতে পারিলাম না! স্নেহের প্রবল তুফানে আজ কর্ত্তব্য ডুবিয়া গেল। অই অশ্রুজলের শক্তি এত বেশী! হোক্—অই মমতা উদ্রেককারী অশ্রুজলেরই বশ্যতা স্বীকার করিতেছি। কিন্তু পান্না আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না, আজ আমাদের শেষ সাক্ষাৎ দিন কি না? তবু একটা কথা বলিয়া রাখি, যদি আমার এ রাজ্য যায়, তোকে পথের ভিখারিণী হইতে হয়—তাহা হইলে তুই যে আফ্‌জাই বাদশা মীরাণশার কন্যা, এ কথা কখনও যেন ভুলিস্ না। তোর মার নাম ছিল ইজ্জতুন্নিসা বেগম। যদি দেখিস

তোর ইজ্জতের কোন বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, তখনই আত্ম-হত্যা করিয়া সে ইজ্জত রক্ষা করিস্।"

আর কিছু না বলিয়া মীরাণশা পান্নার দিকে বিকট দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া উন্মাদের মত অতি দ্রুতভাবে সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

পান্না কক্ষ দ্বারের নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বে, তিনি মহাশব্দে সেই কক্ষ দ্বার বন্ধ করিয়া তাহাতে চাবি লাগাইয়া দিলেন। সে তাহাকে আর কোন কথা বলিবার অবসর পাইল না।

পান্না অগত্যা চঞ্চলহৃদয়ে কক্ষ মধ্যে আসিয়া মাটীতে শুইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশই আমি করিলাম। পিতা! পিতা! আমায় মার্জ্জনা কর। দেখিতেছি এই অভাগিনী কন্যার কর্ম্মফলে, তোমার সব যাইতে বসিয়াছে।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতে, নবাব মীরাণশার খাস-কামরার প্রধান আরদালি হিম্মত খাঁ, তাহার প্রভুকে অভ্যাসের অতিরিক্ত সময় পর্য্যন্ত নিদ্রিত দেখিয়া, জাগাইতে গিয়া দেখিল—মীরাণশা নিশ্চল অবস্থায় শয্যায় পড়িয়া আছেন। হিম্মত সবিস্ময়ে

দেখিল, তাহার প্রভুর দেহ নিঃসাড়, নিস্পন্দ, বিবর্ণ, তুষার শীতল। তাহা হইতে প্রাণবায়ু বহু পূর্ব্বে চলিয়া গিয়াছে।

মীরাণশার হাতের কাছে শয্যার দক্ষিণ পার্শ্বে, একটী হীরকাঙ্গুরীয় পড়িয়াছিল। বিশ্বাসী ভৃত্য হিম্মত বুঝিল, এই জহর চুষিয়াই তাহার বাদশা আত্মহত্যা করিয়াছেন।

হিম্মত ঊর্দ্ধশ্বাসে পান্নার কক্ষে দৌড়াইয়া গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"মা! সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমাদের পাহাড়ের বাদশা, তোমার স্নেহময় পিতা, জহর খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন।"

এ আত্মহত্যার কারণ যে চারিদিকের দারুণ নিরাশা, মানসম্ভ্রম রক্ষার একটা আশঙ্কা, কিম্বা মোগলের বিজয়লাভের পর প্রতিহিংসাময় দারুণ লাঞ্ছনা, আর তাহার নিজের সৃজিত ঘটনাবলী, তাহা বুঝিতে পান্নার আর কিছুই বাকী রহিল না।

পাহাড়ের বুকে অশৈশব প্রতিপালিতা পান্না—পাষাণে প্রাণ বাঁধিল। সে ভাবিল, ক্রন্দনের সময় এ নয়। দুর্ব্বলতা প্রকাশের সময় এ নয়। তবুও ভিতর হইতে একটা মহাঝড় উঠিয়া তাহার মর্ম্মস্থলকে সবলে মুচড়াইয়া দিতে লাগিল। তাহাতে খুবই একটা মর্ম্মন্তুদ যাতনা হইতে লাগিল। কিন্তু খুব চেষ্টা করিয়া সে এমন একটা দৃঢ়তার আবরণ দিয়া, তাহার বিপদকাতর চঞ্চল প্রাণটীকে খুব জোরে বাঁধিয়া ফেলিল—যাহা দেখিয়া হিম্মত বিস্মিত হইল।

পান্না বলিল,—"হিম্মত! বড়ই সঙ্গীন মুহূর্ত্ত আমাদের

সম্মুখে! সর্দ্দারেরা মীরাণবাগেই আছেন। তাঁহাদের সকল কথা বলিয়া এখানে লইয়া আইস। সাবধান! পুরীর মধ্যে আর কেহ যেন এ মৃত্যুর কথা জানিতে না পারে।”

মীরাণ-বাগ প্রাসাদের খুব কাছে। হিম্মত তখনই গিয়া সর্দ্দারদের সংবাদ দিল। তাঁহারা এক গুপ্তদ্বার দিয়া মীরাণশার কক্ষে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহাদের সকলের মুখে একটা উৎকণ্ঠার ভাব ফুটিয়া উঠিল। হইবে না কেন— নবাব মীরাণশাই যে তাহাদের মস্তকস্বরূপ ছিলেন।

রোরুদ্যমানা পান্নার মলিন মুখ দেখিয়া, অনেক সর্দ্দারের চোখে জল আসিল। সকলে তাহাকে মিষ্ট কথায় সান্ত্বনা করিতে লাগিল।

চোখ মুছিয়া পান্না সকলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সে মুখে তখন যেন একটা আত্মনির্ভরতার তীব্রভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার চোখের জল শুখাইয়াছে। স্পষ্টভাবে কথা কহিবার শক্তি ফিরিয়া আসিয়াছে।

সর্দ্দার রসুলখাঁ, পান্নার মুখের দিকে চাহিয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে অশ্রুপূর্ণনেত্রে বলিলেন,—“বাদশা মীরণশার পুত্র থাকিলে তাঁহাকে আমরা যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করিতাম—তোমাকেও সেইরূপ করিতেছি। মানুষ ত চিরদিন থাকে না যা! সুতিকা-গার তাহার জীবনের প্রারম্ভ, কবর তাহার শেষ বিশ্রামস্থান। তবে এই ভীষণ সময়ে খোদা সহসা আমাদের দক্ষিণ বাহুচ্ছেদ করিয়া দিলেন, ইহাতেই আমরা একটু দমিয়া পড়িতেছি।

যুযুৎসু মোগল এতদিন ধরিয়া যে সুযোগ অপেক্ষা করিতেছিল, আজ তাহাদের সে সুযোগ পূর্ণমাত্রায় উপস্থিত। এ মহাসঙ্কট ক্ষেত্রে তুমি কি করিতে চাও মা?"

সর্দ্দারদের এ সাংঘাতিক প্রশ্নে পান্না, বড়ই একটা কঠোর সমস্যার মধ্যে পড়িল। এ কথার উত্তর যে কি দিবে, তাহা সে খুঁজিয়া পাইল না। অগত্যা সে মলিন মুখে বলিল,—আপনারা সকলেই অবস্থাভিজ্ঞ, আমার পিতৃবন্ধু। আপনাদের মতামত এ ব্যাপারে কি, তাহা পূর্ব্বে জানিতে না পারিলে—আমার মত বুদ্ধিহীনা রমণীর, প্রথমে কোন কথা কওয়া ত ঠিক নয়।"

সর্দ্দারগণ একটু সরিয়া গিয়া, কিয়ৎক্ষণ অস্ফুটস্বরে কি একটা পরামর্শ করিলেন। কিন্তু এ পরামর্শের ফল বড় সুখকর হইল না। বিবেচ্য বিষয় লইয়া তাঁহাদের মধ্যে একটা মতভেদ উপস্থিত হইল।

সর্দ্দার রসুল মহম্মদ খাঁ, পান্নার নিকটে আসিয়া বলিলেন,—"মা! আমাদের মধ্যে বিষম মতভেদ ঘটিয়াছে। আমাদের ছয়জনের মধ্যে তিনজন যুদ্ধের স্বপক্ষ। বাকী তিনজন বিপক্ষ। তাঁহারা যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক। তাঁহারা বলিতেছেন—নূতন সেনাপতি নিয়োগ করিয়া এখনই অনতিবিলম্বে মোগল শিবির আক্রমণ করা হউক। কিন্তু অপর পক্ষ বলেন, ইহার ফল অনিশ্চিত, বিপদজনক। সুতরাং তাঁহারা যুদ্ধের বিরুদ্ধবাদী। সন্ধিই তাঁহাদের অভিমত।"

পান্না বলিল,—"যদি আপনারা এ অবলার অভিমত গ্রহণীয় বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা হইলে আমার মতে সন্ধি করাই উচিত। স্বয়ং শাহজাদা দানিয়েল যখন সন্ধিপ্রার্থী হইয়া আমাদের শিবিরে আসিয়াছিলেন,তখন আমাদের কক্ষ হইতে এ সন্ধির প্রস্তাব তাহার প্রত্যুত্তর মাত্র। শাহজাদা সন্ধিসম্বন্ধে যে দুটী প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা আমি হিম্মতের মুখে শুনিয়াছি। আমি একবার ছদ্মবেশে মোগল শিবিরে গিয়াছিলাম। সে কথা এই হিম্মত জানে, আর আমার ঐ পিতা জানিতেন। আপনাদের প্রতিনিধিরূপে আমি আবার মোগল-শিবিরে যাইতে প্রস্তুত। এটুকু আপনাদিগকে নিশ্চয় বলিতে পারি, যে পাঠানপক্ষের সম্মানজনক সর্ত্তে সন্ধি করিতে, আমায় বেশী কষ্ট পাইতে হইবে না। আমাদের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থায় প্রবল শত্রুর শক্তি-পরীক্ষা করা কখনই যুক্তিযুক্ত নয়।"

যাহারা যুদ্ধের সম্বন্ধে মত দিয়াছিলেন—তাঁহারা পান্নার এই যুক্তিপূর্ণ কথায় হঠিয়া গেলেন। পান্নার এ প্রস্তাবে সকলেই বিস্ময়মিশ্রিত একটা আনন্দানুভব করিলেন। তখন সর্ব্ববাদী সম্মত মতে সন্ধি করাই মত হইল।

সর্দ্দার রসুল মহম্মদ বলিলেন,—"কিন্তু মা, আমার মতে তোমার শরীর-রক্ষার জন্য, কিছু সৈন্য সঙ্গে লইয়া যাওয়া উচিত।"

পান্না একটু দর্পিতভাবে শয্যায় অবস্থিত তাহার পিতার মৃতদেহের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল,—"সর্দ্দারগণ!

বড়ই দুঃখের বিষয়—যে আপনারা এত শীঘ্র ভুলিয়া যাইতেছেন, আমি ঐ চিরদর্পিত, চিরস্বাধীন আফ্‌জাই বাদশা মীরাণশার কন্যা। নিশ্চিন্ত থাকুন আপনারা, আমি এমন ভাবে এই সন্ধির ব্যাপার নিষ্পন্ন করিয়া আসিব, যে তাহাতে আপনাদের কাহারও এমন কি আমার মৃত পিতারও সম্মানের কোন হানি হইবে না।"

সর্দ্দারেরা মলিনমুখে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। সেই কক্ষ একেবারে নিস্তব্ধ। হিম্মত অন্যান্য প্রহরীদের সেই স্থান হইতে বিদায় করিয়া দিল।

কক্ষটী জনশূন্য হইলে—পান্না হিম্মতকে বলিল,—"যে সর্ব্বনাশ আজ ঘটিয়াছে, তাহার মূল আমি। আমার পিতা ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ধরিতে গেলে—উত্তরাধিকার সূত্রে এখন এ রাজ্যের অধিশ্বরী আমি। যাহাতে রাজ্য রক্ষা হয়, কণামাত্র শোণিতপাত ব্যতীত যুদ্ধ মিটিয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা আমায় করিতে হইবে। শাহজাদা দানিয়েলকে খোদা কি সুন্দর উপাদানে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা আমি খুবই ভাল জানি। আমি জীবন পণ করিয়া যাহাকে মুক্তি দিলাম—তিনি যে আমার মান রক্ষা করিবেন না—তাহা কল্পনায় আনিতে পারি না।"

হিম্মত বলিল,—"হয়ত তোমার আশা পূর্ণ হইবে। একটা কথা মা—সেই শত্রুশিবিরে কিন্তু আমার মতে একা যাওয়াটা এখন আর তোমার পক্ষে ঠিক নয়।"

পান্না মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তার পর বলিল,—"হিম্মত! আর কেউ

না হোক্, তুমি আমার সঙ্গে যাইতে পার—তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই।"

এ কথায় হিম্মতের শঙ্কাকাতর হৃদয়, যেন একটা আনন্দ বোধ করিল। সে বলিল,—"কবে তুমি শাহজাদার কছে যাইতে মনস্থ করিতেছ মা?"

পান্না। শোকের তিনটা দিন কাটিয়া যাক্। পিতার দেহ সমাধিস্থ হোক, তারপর একটা সুবিধাকর দিনে যাইব। আমার বিশ্বাস এ সন্ধির কাজটা অতি সহজেই হইয়া যাইবে। কিন্তু তার আগে যে সব দায়িত্বপূর্ণ ব্যাপার আমাদের হাতে, সেইগুলি শেষ করিবার জন্যই আমি বেশী ভয় করিতেছি—হিম্মত!

হিম্মত। কিসের জন্য তুমি ভয় করিতেছ?

পান্না। আমার পিতার আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ যাহাতে সাধারণে প্রকাশ না হয়, তার চেষ্টা প্রথমে করিতে হইবে। সতর্ক সর্দ্দারগণকে আমি খুব সতর্ক করিয়া দিয়াছি। এই কক্ষের আরদালি দুইজন আর তুমি ভিন্ন, আর কেহই এ কথা জানে না। এই প্রহরী আরদালিদের বলিয়া দাও, যদি এ মৃত্যু সংবাদ কোনরূপে প্রাসাদের বাহিরে যায়, তাহা হইলে তাহাদের জান যাইবে।

হিম্মত। আর কি কাজ?

পান্না। আজ রাত্রে অতি গোপনে পিতার মৃতদেহ সমাধিস্থ করিতে হইবে। কোন উৎসব ও আড়ম্বর থাকিবে না, কোন জনতাই হইবে না। থাকিবার মধ্যে, কেবল সর্দ্দারগণ, তুমি আর আমি। গভীর নিশীথে সকলে ঘুমাইবার পর, অতি গোপনে

এই দেহ কবরে ফেলিতে হইবে। এখন মহলের মধ্যে প্রকাশ করিয়া দাও, বাদশার ভবিষ্যৎ ভাল নয়। মনে রাখিও—যদি মোগলের সহিত আমাদের একটা মিটমাট হইয়া যাইবার পূর্ব্বে, আমাদের সেনারা জানিতে পারে, যে আমার পিতা ইহলোকে নাই, তাহা হইলে মহা বিভ্রাট ঘটিবে।

হিম্মত অবনত মস্তকে এই সব গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ ভার গ্রহণ করিল। আর পান্না অতি অসহিষ্ণুচিত্তে হিম্মতকে বিদায় দিয়া সেই কক্ষের দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

পিতার বিগতপ্রাণ তুষারশীতল শব দেহ আলিঙ্গন করিয়া পান্না খুব অনেকক্ষণ কাঁদিল। মৃতের শয্যাস্তরণ সেই অশ্রুজলে ভিজিয়া গেল। হায়! তবুও সে নিশ্চল স্পন্দহীন শবদেহ জাগরিত হইল না।

ক্রন্দনের পর তার প্রাণের ভারটা যেন খুব হাল্‌কা হইয়া গেল। তাহার বুকের মধ্য হইতে যেন একটা বিরাট পাষাণের ভার নামিয়া গেল। শৈশবের কিশোরের যৌবনের, সকল সুখ দুঃখের অতীত স্মৃতি একে একে আবির্ভাব হইয়া তাহাকে বড়ই জ্বালাতন করিয়া তুলিল।

পান্না মনে মনে ভাবিতে লাগিল, কি ভীষণ ভাগ্যবিপ্লব হইল আজ আমার! এ বিশাল সংসারে যে আমি একা। পিতা নাই, মাতা নাই—আপনার বলিবার কেহই নাই। এখন আত্মীয় স্বজন যা কিছু—এই চিরবিশ্বাসী হিম্মত। যদি মোগলের সহিত সন্ধি না হয়, যদি মোগল বাদশাহ আমার হাত হইতে রাজ্য

কাড়িয়া লন, তাহা হইলে কোথায় দাঁড়াইব আমি ? কে আশ্রয় দিবে আমাকে ? খোদা ! প্রভু ! আর যে নিরাশার মর্ম্মচ্ছেদী ভাবনা ভাবিতে পারি না।

পান্না অনেকদিক দিয়া তাহার ভবিতব্যের কথাগুলি ভাবিল। ভাবিতে ভাবিতে,সে বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িল। ক্লান্তি অবসাদকে আনিল, অবসাদ সুষুপ্তি আনিয়া দিল। অভাগিনী পান্না, তাহার বহুমূল্য ওড়নাখানি হর্ম্ম্যতলে বিছাইয়া, তাহার উপর শুইয়া পড়িল ! পরক্ষণেই সে নিদ্রামগ্না হইল।

হায় ! যে নিদ্রা—পুত্রবিয়োগবিধুরা মাতা, স্বামীবিহানা বিধবাকে, ক্ষণকালের জন্য শান্তি আনিয়া দেয়, তাহার সকল যন্ত্রণা কয়েক ঘণ্টার জন্য অবসান করিয়া দেয়, সেই বিরাম দায়িনী দুশ্চিন্তানাশিনী শান্তিময়ী নিদ্রার কোলে থাকিয়াও এই জ্বালাময়ী দুর্ভাগ্যবিতাড়িতা নবাবজাদি পান্না, কোন শান্তিই পাইল না।

সে স্বপ্নে দেখিল, যেন সে এই আফগাই-রাজ্যের রাণী হইয়াছে। রাণীগিরির যাহা কিছু আনন্দ, সুখ, ঐশ্বর্য্য, আধিপত্য অধিকার সবই সে ভোগ করিতেছে—তবু যেন তাহার প্রাণে শান্তি আসিতেছে না। সে যেন বিছানায় শুইয়া কাঁদিতেছে। অশ্রুজলে শুভ্র উপাধান ভিজিয়া যাইতেছে—এমন সময়ে তাহার পিতা যেন অতি ধীরে সেই শয্যার শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

তাঁহার মুখ অতি বিবর্ণ। তেজ দীপ্তি লাবণ্য সবই যেন সে মুখ হইতে ঝরিয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বের আয়ত নেত্রদুটি কোটর গত—

শ্বাসপ্রশ্বাসে যেন একটা মহাকষ্ট—দৃষ্টিতে অস্ফুট কাতরতা—ভাষায় অবসাদময় কম্পন।

পিতা যেন বলিতেছেন,—"এই কক্ষ, এই শয্যা. এই সিংহাসন. এই রাজ্য, এই ঐশ্বর্য্য, একদিন আমার ছিল যে পান্নামতি! আজ তুই সেই ঐশ্বর্য্য ও রাজ্য অধিকার করিয়াছিস্! কিন্তু আমার এ শোচনীয় মর্ম্মবেদনাময়, অপমৃত্যুর জন্য দায়ী কে পান্না? তোকে শত্রুর হাতে দিতে হইবে, এই মহা ভয়েই যে আমি পাগল হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছি। মোগলের লালসাদৃপ্ত রঙ্গমহলে বিলাসের দাসী হইয়া. তুই একদিন কুক্কুরীর ন্যায় পদাহতা ও লাঞ্ছিতা হইবি, তথা হইতে কলঙ্ককালিমা মাখিয়া বিতাড়িতা হইবি, তোর সেই শোচনীয় ভবিষ্যৎ ভাবিয়া যে আমি ক্ষণিক উন্মত্ততায় অধীর হইয়াছিলাম। সেজন্য সকল চিন্তার হাত হইতে এড়াইবার উপায়ান্তর না দেখিয়া. আমি জহর চুষিয়া আত্মহত্যা করিয়াছি। কই পান্না—আমার এই শোচনীয় আত্মহত্যার প্রতিশোধ লইলি তুই কই? ছিঃ ছিঃ! বৃথা তুই আমার কন্যা হইয়া জন্মিয়াছিলি!"

সহসা পান্নার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সে ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়া কক্ষের চারিদিকে চাহিল। কোথায় তাহার পিতা? সেই স্নেহময় পিতার নিস্তব্ধ, নিশ্চল, তুষারশীতল, স্পন্দমাত্র বিহীন দেহ যে—তখনও সেই শয্যার উপরে!

পান্না ভয়ে শিহরিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল—"হিম্মত! হিম্মত!"

চিরবিশ্বাসী স্নেহময় ভৃত্য দ্বারের বাহিরে বসিয়াছিল। ভিতরে আসিয়া ত্রাস্তভাবে বলিল,—"কেন মা? তোমার মুখ অত বিবর্ণ কেন? ভয় পাইয়াছ কি?"

পান্না। হিম্মত! পিতাকে স্বপ্নে দেখিয়াছি। তাঁর মৃত্যুর প্রতিশোধ এখনও লই নাই বলিয়া, তিনি আমায় কত তিরস্কার করিলেন!

হিম্মত উৎসাহসূচক স্বরে বলিল,—"ও সব স্বপ্ন! স্বপ্ন কি কখনও সত্য হয় মা?"

পান্না একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কম্পিতস্বরে বলিল,—"কখনও কখনও হয় বই কি হিম্মত!"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সেইদিন গভীর নিশীথে আকাশে সহসা খুব কালো মেঘ দেখা দিল। ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাতে, যেন প্রলয় ঘটিবার উপক্রম হইল।

এই ঝড়বৃষ্টি বজ্রাঘাত মাথায় করিয়া, পান্না সর্দারগণকে ও তাহার বিশ্বাসী ভৃত্য হিম্মতকে লইয়া, তাহার পিতার মৃতদেহ তাহাদের পারিবারিক মসৌলিয়ামের তুষার শীতল সমাধিগর্ভে প্রোথিত করিল। তৎপরে সমাধিসৌধের দ্বারে চাবি লাগাইয়া দিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে নিজের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল।

পান্না দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া শয্যায় শুইয়া খুবই কাঁদিল। সমুদ্রের স্রোতের যেমন বিরাম নাই—তাহার কান্নারও যেন সেইরূপ শেষ নাই। কিন্তু হায়! যে জন্মের মত চলিয়া যায়, সে কি কাঁদিলে ফিরিয়া আসে?

বাল্যে ও কৈশোরে, পান্না জীবনে অনেকবার পিতৃবিদ্রোহী হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার শেষ বিদ্রোহাপরাধের যে মার্জ্জনা নাই। সে যদি মোগল শাহজাদাকে মুক্ত করিয়া না দিত, তাহা হইলে ত এত অনর্থ ঘটিত না!

অভাগিনী পান্না মনে মনে ভাবিল—"পিতা আমার—ইচ্ছা-মৃত্যুর অধীন হইয়া, এই স্কন্ধে অনেক দায়িত্ব ফেলিয়া দিয়া গিয়াছেন। সম্মুখে যুদ্ধ সম্ভাবনা, রাজ্য রাজা শূন্য—মন্ত্রীরা বুদ্ধি শূন্য – সেনাগণ উৎসাহ শূন্য। কোন বিপদ ঘটিলে সর্দ্দারগণ প্রথমেই নিজেদের জান বাঁচাইবার চেষ্টা করিবেন। তখন আমার উপায় কি হইবে?"

"যদি মোগলেরা এই যুদ্ধে জয়ী হয়? তাহা হইলে মোগল সেনাপতি শাহজাদা দানিয়েল কি তাহাকে তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবেন? সত্যই সে কি মোগলের বাঁদী-রূপে আগরার রঙ্গমহলে প্রেরিত হইবে? এই শস্যসম্পদশালী বিশাল পার্ব্বত্য রাজ্য কি শ্মশানভূমিতে পরিণত হইবে?"

"না—না, এ সব হইতে দিব না। সেই সৌম্যশান্তমূর্ত্তি, চিরসহাস্যবদন, শাহজাদার পায়ে ধরিয়া আমি করুণা ভিক্ষা করিব। আমার সন্তানপ্রতিম প্রজাগণকে মোগলের রোষাগ্নি

হইতে রক্ষা করিব! বিন্দুমাত্রও শোণিতপাত হইতে দিব না। আমার কোন পাঠানসেনাই অসি কোষমুক্ত করিবে না। নারীর প্রলয়ঙ্করী শক্তি—যাহা এই দুনিয়ায় যুগপৎ স্বর্গনরক সৃষ্টি করিতে পারে—তাহা কি আমার নাই? পারিব না? নিশ্চয়ই পারিব। চেষ্টায় রাজ্য শ্মশানস্তূপে পরিণত হয়,—আর রাজ্য রক্ষা হয় না? নারীর শক্তিতে না হয় কি? নারী কার্য্যগুণে এ সংসারে দেবী বা শয়তানী। শয়তানের সহায়তা যদি প্রয়োজন হয়, তাহাও গ্রহণ করিব।"

"একদিন এই নারীর শক্তিতে ত মোগল শাহজাদার উষ্ণীস উড়াইয়া দিয়াছিলাম। আর আজ অতি দীনাহীনার মত অশ্রু পূর্ণ নয়নে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া, এ রাজ্যকে বাঁচাইতে পারিব না? একদিন যে বহুমূল্য জীবন রক্ষা করিয়াছি—সে জীবনের কি কোন মূল্যই নাই? অযাচিত স্বার্থহীন উপকারের কি কোন কৃতজ্ঞতা নাই? দানের কি প্রতিদান নাই?"

"বিশাল হিন্দুস্থানের সম্রাট আকবরশার পুত্র যিনি, অত উদার সরলচিত্ত যাঁর, তাঁর কাছে কি আমি এটুকুও আশা করিতে পারি না? জানি আমি—উপকার করিয়া তাহার প্রতিদান প্রার্থনা অতি হীনতা! কিন্তু যে প্রজাগণ এত দিন আমার পিতার মুখ চাহিয়াছিল, এখনও যাহারা আমার মুখ চাহিয়া আছে, তাহাদের রক্ষা করিবার জন্য এ হীনতা স্বীকারেও আমি সহস্রবার প্রস্তুত।"

পান্না নানাদিক দিয়া সকল কথা বিবেচনা করিয়া স্থির

করিল—যতদিন না মোগলের সহিত সন্ধি শেষ হয়, ততদিন সর্দ্দারদের হাতেই এই রাজ্যভার দেওয়া উচিত।

শোকের রাত্রি, সুখের রাত্রি, কাহার ত মুখ চাহিয়া থাকে না। সুতরাং এই শোক রাত্রির অবসান মুখে, চিন্তাজনিত দারুণ ক্লান্তিবশে, পান্নামতি শেষ রাত্রে একটু ঘুমাইয়া শান্তি পাইল।

পরদিন প্রভাতে হিম্মত খাঁ আসিয়া, পান্নাকে সংবাদ দিল—সর্দ্দারগণ তাহার সহিত সাক্ষাতার্থী হইয়া দরবার—কক্ষে অপেক্ষা করিতেছেন।

পরদিনের কর্ত্তব্য যে কি, তাহা সে পূর্ব্ব রাত্রেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং পান্না বিধাতাকে স্মরণ করিয়া, সেই উষাকিরণসমুজ্জ্বল স্নিগ্ধপ্রভাতে, রাজরাণীর মত উজ্জ্বল বেশ-ভূষা পরিয়া, দরবারকক্ষে উপস্থিত হইবামাত্রই সর্দ্দারগণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার সম্বর্দ্ধনা করিল।

সর্দ্দারদের এতটা সম্মানে ও আদরে, পান্না বড়ই সংকুচিত হইয়া পড়িল। সে সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল—"এ রাজ্য আপনাদের। প্রজারা আপনাদের মুখের দিকে চাহিয়া আছে, যুদ্ধার্থী পাঠান সেনারা আপনাদের হুকুম প্রতীক্ষা করিতেছে। পিতা ইহলোক ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন—এখন এ পাঠান রাজ্যরক্ষার ভার আপনাদের উপর। আমি ছায়া মূর্ত্তি মাত্র। আমার অস্তিত্ব আপনারা ভুলিয়া যান।"

এই কথা বলিয়া পান্না রাজকোষের চাবিটি সর্দ্দারদের হস্তে অর্পণ করিতে গেল। কিন্তু তাঁহারা তাহা না লইয়া, পান্নাকে

প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন—"মা! তোমার পিতার কাছে আমরা অনেক বিষয়ে ঋণী। আমরা করদাতা ভূস্বামী, অথচ প্রকারান্তরে স্বাধীন সামন্ত প্রদেশাধিপতি হইলেও, তোমার পিতাকেই আমাদের বাদশা বলিয়া জানিতাম। রাজকোষের চাবি তোমার কাছেই এখন থাক। যদি কখনও আমাদের অর্থের প্রয়োজন হয়, তোমার নিকট চাহিয়া লইব।"

সর্দ্দারগণ পবিত্র কোরাণস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, "যতদিন তাঁহাদের জীবন থাকিবে, সুখে-দুঃখে, আপদে সম্পদে, তাঁহারা পান্নাকে কখনই ত্যাগ করিবেন না।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সম্রাট আকবরের পুত্র, এই আফ্‌জাই সমরের প্রধান সেনাপতি, শাহজাদা সুলতান দানিয়েল, একদিন সন্ধ্যার পর তাঁহার শিবির মধ্যস্থ এক উজ্জ্বলিত কক্ষে বসিয়া, একখানি পত্রের দিকে তাঁহার দৃষ্টি সম্বদ্ধ রাখিয়া, মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন। এ পত্রখানি লাহোর হইতে আসিয়াছে—আর এ পত্রের লেখিকা লালা—রুখ্‌ বেগম। এই লালা—রুখ্‌ শাহজাদার প্রিয়তমা-আদরিণী ও সোহাগিনী পত্নী! দিন কতকের বিরহে অতি কাতরা হইয়া, বেগম তাঁহাকে শীঘ্র শীঘ্র যুদ্ধ সারিয়া লাহোরে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। যেন যুদ্ধটি সারিয়া ফেলা শাহজাদার সম্পূর্ণরূপে নিজের আয়ত্বের মধ্যে।

শাহজাদা মনে মনে বলিতেছিলেন—"অয়ি মুগ্ধে! তুমি এই পত্রখানি লিখিবার সময়, একবারও কি ভাবিয়া দেখ নাই, যে রণনীতি ও প্রেমনীতির মধ্যে তিলমাত্রও সম্প্রীতি নাই। রঙ্গ মহলের সীমার মধ্যে আমি তোমার হুকুমের তামিলদার বটে—কিন্তু এই যুদ্ধক্ষেত্রে, মুলুকের মালেক, সেই সম্রাট আকবরশাহের হুকুম মানিয়া চলিতে আমি যে ষোল আনা বাধ্য!"

শাহজাদা তখন নিজের সাংসারিক সুখ চিন্তায় বিভোর। সম্মুখে রক্ষিত স্ফটিকাধার মধ্যস্থ গুলাবগন্ধী বসোরাই সেরাজি— তাঁহার স্পর্শানুগ্রহের আশায় উজ্জ্বল দীপের আলোতে খুবই রক্তবর্ণ দেখাইতেছিল। এই সময়ে একজন প্রহরী আসিয়া সেলাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে একটী অঙ্গুরীয় ধরিল।

শাহজাদা সেই অঙ্গুরীয় দেখিবামাত্রেই চিনিতে পারিয়া স্মিতমুখে বিস্মিতচিত্তে বলিলেন—"কে এ অঙ্গুরীয় আনিয়াছে?"

প্রহরী বলিল—"এক জেনানা!"

শাহজাদা বিস্ময়পূর্ণ স্বরে বলিলেন—"জেনানা! এই রাত্রিকালে? সে কি চায়?"

প্রহরী। সে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চায়!

শাহজাদা। এ অসময়ে এরূপ অসম্ভব সাক্ষাতের কারণ কি?

প্রহরী। আমি তাহাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম মেহেরবান! কিন্তু সে কিছুই বলিতে চাহে না।

শাহজাদা ওষ্ঠাধর দংশন করিতে করিতে কি ভাবিতে

লাগিলেন। তারপর বলিলেন—"খুব সম্মানের সহিত বিবিকে আমার কাছে লইয়া আইস।"

প্রহরী চলিয়া গেলে, শাহজাদার নেত্রদ্বয় সমুজ্জ্বল ভাব ধারণ করিল। তাঁহার মুখে একটী আনন্দের জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল। অপ্রত্যাশিত প্রিয়জনের অকস্মাৎ আগমনে, মানবের মনে যে ভাবের আনন্দ দেখা দেয়, তাঁহার এই সময়ের অবস্থাটা ঠিক যেন সেইরূপ।

মুহূর্ত্ত মধ্যে সম্মুখস্থিত পান পাত্রটি নিঃশেষ করিয়া, শাহজাদা উৎসুকনেত্রে প্রবেশ দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিলেন। দেখিলেন, সেই প্রহরী এক রমণীকে সঙ্গে লইয়া আসিতেছে। সেই রমণীর আপাদমস্তক কৃষ্ণবর্ণ বোরখায় আবৃত।

শাহজাদার সম্মুখে আসিয়াও সে মুখ খুলিল না। কেবলমাত্র সেই প্রহরীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। দানিয়েল তখনই প্রহরীকে সেস্থান হইতে সরিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন।

সেই রমণী তাহার মুখের অবগুণ্ঠন মোচন করিবামাত্রই শাহজাদা সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—"একি! একি! পান্নামতি! নবাবজাদা! এ রাত্রে, এ অসময়ে কি মনে করিয়া পান্না?"

এই কথা বলিয়াই শাহজাদা একটা তীব্র আনন্দবশে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া আসিয়া, পান্নার হাত ধরিয়া—তাহাকে তাঁহার পার্শ্বস্থ আসনে বসাইলেন। তারপর সহাস্য মুখে বলিলেন—"ব্যাপার কি পান্না? তুমি কি আফ্‌শান খাঁকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছ?"

শাহজাদা সরলচিত্তেই এ কথাটা বলিয়াছিলেন। কিন্তু পান্না ভাবিল—এটা কঠোর বিদ্রূপ!

পান্না, শাহজাদার এ রহস্যে যেন একটু বিরক্ত হইল। সে মনে মনে বলিল—"এত সুন্দর করিয়া বিধাতা বাহিরে যাহাকে গড়িয়াছেন—সেই শাহজাদা অন্তরে এত নিষ্ঠুর কেন?"

পান্না যাহা ভাবিতেছিল—শাহজাদা দানিয়েল তখনই যেন তাহা বুঝিয়া লইয়া বলিলেন—"পান্না! আমার কথায় তুমি কি রাগ করিলে?"

পান্না বলিল—"আপনি এই হিন্দুস্থানের মালেক, সম্রাট আকবরের পুত্র। এই বিশাল মোগল-বাহিনীর সেনানায়ক। আপনার উপর রাগ করা, আমার মত ক্ষুদ্রার পক্ষে সম্ভব নয়।"

শাহজাদা একটু মনোযোগের সহিত পান্নার মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবামাত্রই দেখিতে পাইলেন, তাহার মুখ যেন অতি পাংশুবর্ণ, অতি মলিন। সেই মলিন মুখে নিরাশার ছায়া, সেই বিশীর্ণ গণ্ডে কাতরতার চিহ্ন, সে দৃষ্টিতে যেন বিষাদ মাখা। পূর্ব্বপরিদৃষ্ট সেই দর্পিতা, স্ফুরিতাধরা প্রফুল্লমুখী, পান্নাতো এ নয়?

শাহজাদা ব্যগ্রভাবে পান্নার হাত দুখানি ধরিয়া বলিলেন—"ব্যাপারটা কি পান্না?"

পান্না। শাহজাদা! আমি পিতৃহীন হইয়াছি!

সে আর বলিতে পারিল না। তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ, হৃদয় দ্রুত কম্পিত, স্বর শক্তিহীন, মুখ আরও মলিন হইল।

শাহজাদা। তখনিই উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিস্মিতমুখে বলিলেন—সে কি অসম্ভব কথা! ব্যাপার কি? অতীতদিনে যে আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছি পান্না? এর মধ্যে এমন কি ঘটিল?"

পান্না। তিনি জহর চুষিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন।

শাহজাদা বিস্মিতচিত্তে পান্নার মুখের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, সেই আয়ত নলিননেত্র পুনরায় অশ্রুধারায় পরিপূর্ণ। চোখের পাতার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে না পারিয়া সেই অশ্রুধারা তাহার গণ্ড বহিয়া পড়িতেছে।

শাহজাদা ব্যগ্রভাবে মলিনমুখে পান্নার দক্ষিণ হস্তটী ধরিয়া বিস্ময় বিমুগ্ধচিত্তে বলিলেন—"পাঠান বাদশার এ আত্মহত্যার কারণ কি?"

পান্না। কারণ আপনি? কারণ আমি!

একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শাহজাদা বলিলেন, "বুঝিয়াছি। তোমার পিতার শোচনীয় মৃত্যুতে আমি বড়ই দুঃখিত। বড়ই অনুতপ্ত। সত্যই আফ্‌শানকে বন্দী করিয়া আমি তাঁর দক্ষিণ বাহু ছেদ করিয়া দিয়াছিলাম। এই আফ্‌শানের মুখেই শুনিয়াছি, আমাকে মুক্তি দেওয়ার জন্য তোমাকেও অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে। আমাকে সংবাদ দিলেই ত আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতাম! এখানেএ রাত্রে এত কষ্ট স্বীকার করিয়া আসিবার প্রয়োজন কি ছিল পান্না?"

পান্না একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল

"আছে—খুবই প্রয়োজন আছে। আমি জনাবের নিকট সন্ধিপ্রার্থিনী হইয়া আসিয়াছি!"

শাহজাদা। যাঁহার সহিত আমার বিবাদ ছিল, তিনি ত চলিয়া গিয়াছেন। তোমার সহিত ত আমার কোন শত্রুতাই নাই—পান্না বেগম! এখন তুমি এই আফ্‌জাই রাজ্যের একাধিশ্বরী। তোমার সহিত আমার কোন বিবাদই নাই।

পান্না। আপনার না থাকিতে পারে কিন্তু হিন্দুস্থানের বাদশাহ, আপনার গৌরবান্বিত পিতা আকবরশাহ—?"

শাহজাদা। তাঁহাকে বুঝাইবার ভার আমার রহিল। যদি তিনি না বুঝিয়া আবার তোমাদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হন, এক সহায়হীনা, পিতৃমাতৃহীনা, নিরপরাধিনী অবলার রাজ্য কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করেন—স্থির জানিও পান্না! আমি এ যুদ্ধের সেনাপতিত্ব ত্যাগ করিব।

শাহজাদার হৃদয়ের এ উদারতা দেখিয়া, পান্না মনে মনে তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিল। তারপর অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল মুখে বলিল—"তাহা হইলে কি করারে আপনি আমাদের সহিত সন্ধি করিতে পারেন?"

শাহজাদা একটু গম্ভীর মুখে বলিলেন—"করার কিছুই নাই। তোমার স্বাধীন রাজ্যের তুমি একাধিশ্বরী। মীরণশার সহিত আমাদের যে বিবাদ ছিল, তাহা তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গেই মিটিয়া গিয়াছে। তবে একটী করার এই—এই নব রাজ্যেশ্বরী

পান্না বেগমকে, একবার আমার সহিত লাহোরে বা দিল্লীতে সম্রাট সাক্ষাৎকারে যাইতে হইবে ?”

পান্না। কেন ?

শাহজাদা। আমার পিতার নিকট বশ্যতা স্বীকার করিবার জন্য !

পান্না। যখন আপনার কাছে বশ্যতা স্বীকার করিলাম, তখন সেখানে যাইবার প্রয়োজন কি শাহজাদা ?”

শাহজাদা একটু কৃত্রিম কোপের সহিত বলিলেন—“আমি কে—পান্না ? যিনি রাজ্যেশ্বর—যিনি প্রকৃতপক্ষে এই বিগ্রহের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহার সহিত নব রাজ্যাধিকারিণীর একবার সাক্ষাৎ হওয়া ঠিক নয় কি ? আমি কি শুধু হাতে রাজধানীতে বাদশাহের নিকট ফিরিয়া যাইব—পান্না ? পান্না এ কথাটা বড় সহজ বলিয়া শোধ করিল না। শুষ্কমুখে বলিল, “যদি আমি না যাই শাহজাদা !”

শাহজাদা, গম্ভীর মুখে বলিলেন—“তাহা হইলে পান্না—এখন হইতেই তুমি আমার বন্দিনী। তোমাকে আর তোমাদের সেনাপতি আফ্‌শানখাঁকে, কোন প্রকারে পাক্‌ড়াও করিয়া, সম্রাটের নিকট পৌছাইয়া দিতে পারিলে—এ যুদ্ধের সেনাপতি বলিয়া আমার মুখ রক্ষা হয়। আমি পাহাড়ী বাদশা মীরণশাকে বন্দী করিবার জন্য, বাদশাহের আদেশ পাইয়াছিলাম—কিন্তু তাহা ঘটিল না। তবে যুদ্ধের পরিণাম রূপে তোমাদের দুইজনকে বাদশাহের দরবারে উপস্থিত করিলেই

আমার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। এরূপ সুযোগ পাইলে কেহ কখনও ছাড়ে কি?"

এ কথা শুনিয়া পান্নার বুক দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল। তাহার প্রাণের মধ্যে একটা ভীষণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। সে মনে মনে ভাবিল—"যে মোগল—এই পাঠান জাতির চিরশত্রু, তাহার কাছে সন্ধিপ্রার্থিনী হইয়া, এইরূপ নিঃসহায় অবস্থায় আসিয়া আমি বড়ই অন্যায় কাজ করিয়াছি।"

পান্নার ভীতিকাতর শুষ্ক মুখ দেখিয়া, শাহজাদার বড়ই দয়া হইল। তিনি প্রকৃতপক্ষে পান্নার সহিত রহস্য করিতেছিলেন মাত্র। কিন্তু পান্না তাঁহার কথার ভঙ্গীতে সেটা প্রকৃত ব্যাপার বলিয়াই বিবেচনা করিয়াছিল।

শাহজাদা সহাস্যমুখে বলিলেন—"পান্না বেগম! তুমি এখনও মোগলকে চিনিতে পারিলে না, এই বড় দুঃখ! আমি তোমার সহিত একটু রহস্য করিতেছিলাম মাত্র—যদিও এ রহস্য—তোমার বর্ত্তমান শোকের সময়ে বড়ই বিরক্তিকর। পান্না—আমি আমার পিতার আদরের সন্তান। তাঁহাকে আমি যাহা বলিব—যে পরামর্শ দিব, তাহাই তিনি করিবেন। তোমাকে লাহোরে লইয়া যাওয়া আমার স্বাধীন ইচ্ছাধীন।"

"পান্না বেগম! মনে ভাবিও না, যে মোগল অকৃতজ্ঞ। আমায় কারাগার হইতে উদ্ধার করিবার পর—তুমি আমার জন্য অনেক কষ্ট ভোগ করিয়াছ। সেজন্য আমি তোমার কাছে বড়ই কৃতজ্ঞ, আর ততোধিক লজ্জিত। আমি জানি

পান্না! খোদা তোমাকে কি উপাদানে তৈয়ারী করিয়াছেন। তুমি শৌর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যে রমণীরত্ন। তুমি সর্ব্ববিষয়ে গরীয়সী—মহিমময়ী! হায় পান্না! আজ যদি আমার জীবনসঙ্গিনীরূপে, তোমার মত প্রখর বুদ্ধিশালিনী শক্তিময়ী কোন রমণীকে আমি পাইতাম—তাহা হইলে বোধ হয় আমায় পিতার নিকট হইতে অর্দ্ধেকটা হিন্দুস্থান আদায় করিয়া লইতে পারিতাম!"

"যাও পান্না! তোমার গৌরবমণ্ডিত শোকদুঃখ স্মৃতি বিজড়িত কক্ষে ফিরিয়া। তোমার রাজ্য স্বাধীন—প্রজা স্বাধীন—তোমার ইচ্ছা স্বাধীন—শক্তিও স্বাধীন। খালি তাই নয়—এই সঙ্গে আমি আফ্‌শান্‌কেও মুক্তি দিতেছি। শুনিয়াছি, এই আফশান খাঁ তোমার প্রতি খুব অনুরক্ত। আশীর্ব্বাদ করি, ভবিষ্যৎ জীবনে তুমি সুখী হও। এ আশীর্ব্বাদ ছাড়া আমার আরও একটু কর্ত্তব্য আছে। সে কর্ত্তব্য—আর কিছুই নয়, আমি নিজে গিয়া তোমার মস্তকে রাজ্যেশ্বরীর গৌরবমুকুট পরাইয়া দিব। এই আমার সন্ধি—এই আমার প্রস্তাব!"

পান্নার আয়ত নেত্র দুটী আবার কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। সে মনে মনে বলিল—"এত দয়া তোমার! এত মার্জ্জনা তোমার! এত উদার তুমি? এত মহৎ তুমি! যাহা কখনো জীবনে দেখি নাই, আজ তাহাই দেখিলাম। যাহা কখনও স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারি নাই, আজ তাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিলাম।"

পান্না তখনই আসন হইতে নামিয়া নতজানু হইয়া, বাদশাহ পুত্রের পদযুগ ধরিয়া বলিল—"শাহজাদা! আপনার মহত্ত্ব গুণে আমি অনেক পাইলাম, কিন্তু অতি অভাগিনী, অনাথিনী আমি। আমার ত প্রতিদান রূপে দিবার কিছু নাই শাহজাদা!"

শাহজাদা কথাটা চাপিয়া দিবার জন্য, পান্নাকে বলিলেন—"এই নাও মোগল শিবিরের "কারাগারের চাবি। আমার এক প্রহরী তোমার সঙ্গে যাইতেছে। তুমি নিজেই আফ্‌শানকে কারামুক্ত করিয়া আনগে!"

শাহজাদা তখনই সমশের খাঁকে ডাকিয়া বলিলেন—"সমশের! নবাব মীরণশার কন্যাকে কারাগার দেখাইয়া দাও। পাঠান সেনাপতি আফ্‌শান খাঁ, এই মুহূর্ত্ত হইতে স্বাধীন। আর যে নয় জন পাঠান সেনা বন্দী হইয়া আছে—তাহাদেরও মুক্তি দিয়া—এই বেগম সাহেবের শরীররক্ষক রূপে এঁর সঙ্গে পাঠাইয়া দাও।"

পান্না আর বেশী কিছু বলিতে পারিল না। সে শাহজাদার নিকট হইতে চাবিটী লইয়া কারাকক্ষের দিকে চলিয়া গেল। তাহার পিছনে পড়িয়া রহিল—তাহার হৃদয়, হৃদয়ভরা কৃতজ্ঞতা, মানব হৃদয়ের মহত্ত্বের একটী সমুজ্জল স্মৃতি,—আর অশ্রুজল!

বিনা রক্তপাতে, বিনা যুদ্ধে, বিনা পরিশ্রমে সম্রাট-পুত্র শাহজাদা দানিয়েল এই ভাবেই আফজাই সাম্রাজ্য অধিকার করিলেন। পান্নাও আফ্‌শানকে কারামুক্ত করিয়া শিবিকারোহণে সে স্থান ত্যাগ করিল।

বলা বাহুল্য পরদিনের প্রভাতেই সওয়ার ডাকে, মীরণশার মৃত্যু সম্বন্ধে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া, শাহজাদা, সম্রাটকে এক পত্র লিখিলেন।

চারিদিন পরে, এ পত্রের জবাব আসিল। সম্রাট লিখিয়াছেন—"তোমার উপর সকল ভারই তো আমি দিয়াছি। যাহা কর্ত্তব্য বোধ করিবে—তাহাই করিবে। নবাব মীরণশার শোচনীয় মৃত্যুতে আমি আন্তরিক দুঃখিত। বিধাতা তাঁহার মুক্ত আত্মার মঙ্গল করুন। নবাবজাদী পান্নামতির অভিষেকের দিনে তাহাকে আমার প্রসাদ চিহ্ন স্বরূপ, এই পোষাক ও খেলোয়াত গুলি উপহার দিবে।"

সম্রাটের পত্র পাইবার পরই—শাহজাদা পান্নাকে সমস্ত সংবাদ অবগত করাইলেন। পান্না বুঝিল—"পিতার হৃদয়ের মহত্ব ও উদারতা, পুত্রে সংক্রামিত হওয়ায়, আজ তাহার ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পান্নার অভিষেকের পর তিনটী দিন কাটিয়াছে। শাহজাদা এখন আফজাই—রাজপ্রসাদের একজন মাননীয় অতিথি। বিনা রক্তপাতে, লোকক্ষয়ে, মান সম্ভ্রম রাজ্য ও সেনা সবই বাঁচিয়া গেল, এজন্য সর্দ্দারগণ, ও আর সকলেই আকবরশাহের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন। উভয় পক্ষেই একটা প্রীতি ও আনন্দের

ভাব। কেন না, তখন সকল মেঘ কাটিয়া গিয়া, আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে।

এই পান্না রাজ্যাধিকারিণী ত নিশ্চয়ই হইত, তবে ভবিতব্য-বশে ঘটনাটা যেন ঘটিয়া গেল—কিছু দিন আগে! মীরণশা বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। কতদিনই বা আর তিনি বাঁচিতেন?

দানিয়েলের ব্যবস্থায়, আফ্‌শান খাঁ পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেও আশায় আশায় আছে—কবে তাহার আকাঙ্ক্ষিত সৌভাগ্যের দিন সমুদিত হইবে!

আর শাহজাদা দানিয়েল, এই সূত্রে সর্দ্দারগণকে প্রতিশ্রুতি করাইয়া লইয়াছেন—যে যতদিন পর্য্যন্ত না পান্নার বিবাহ হয়, ততদিন এই সর্দ্দার-সমিতিই মীরণশার অধিকৃত রাজ্য চালাইবেন।

একদিন সন্ধ্যার পর, পূর্ব্বলিখিত হাওয়া-বারান্দার এক মর্ম্মরাসনের উপর, পান্না উৎকণ্ঠিতচিত্তে শাহজাদার আগমন প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া আছে, এমন সময়ে রাজকুমার দানিয়েল নিঃশব্দপদসঞ্চারে তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

শাহজাদার বাসের জন্য, মীরণশার অধিকৃত, সুন্দরভাবে সজ্জিত, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কক্ষগুলিই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। পান্না দিবসের অধিকাংশ সময়ই, তাঁহার সহিত গল্প করিয়া কাটাইত। সে নিজেই বাঁদীরূপে তাঁহার শয্যা রচনা করিত, তাঁহার আহার্য্যাদি সাজাইয়া দিত, সাকির মত, স্বহস্তে, তাঁহাকে মদিরা ঢালিয়া দিত। তাঁহাকে সেতার ও বীণ্‌ শোনাইত। কিন্তু [illegible]র

নির্ব্বন্ধের সহিত অনুরুদ্ধ হইয়াও, সে তাঁহার সম্মুখে কখনও গান গাহে নাই। কেননা—তাহাতে যেন তাহার বড়ই লজ্জা করে।

প্রীতি, স্নেহ, প্রাণঢালা যত্ন ও পরিচর্য্যা, বহুক্ষণ ব্যাপী সাহচর্য্য, সংকোচবিহীন আলাপ—প্রভৃতি এক সঙ্গে জোট্ পাকাইয়া, উভয়ের মধ্যে যে একটা বাধো-বাধো ভাব ছিল, দূরত্বের সংকোচ ছিল, তাহা যেন অনেকটা শিথিল করিয়া দিয়াছে।

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। চাঁদের বিমল রশ্মি পড়ায়, হাওয়া-বারান্দার শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত স্তম্ভসমূহ, ও মিনারের উচ্চ চূড়াগুলি যেন প্রভাততুষারমণ্ডিত বলিয়া বোধ হইতেছিল। অসংখ্য দীপালোক, সেই মিনার কাজ করা স্তম্ভগাত্রের লতাপাতার গায়ে পড়িয়া, চিকমিক করিতেছে। আর পান্না, এক প্রস্তর নির্ম্মিত ক্ষুদ্র স্তম্ভের উপর হেলান দিয়া শাহজাদার আশা প্রত্যাশিতা হইয়া, আকাশের চাঁদের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে।

শাহজাদার আগমনে বিলম্ব দেখিয়া, পান্না বড়ই অসহিষ্ণু-চিত্তে আপনা আপনি বলিয়া উঠিল,—"ওঃ! কি নিষ্ঠুর?"

শাহজাদা দানিয়েল আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া পিছন হইতে বলিয়া উঠিলেন,—"কে নিষ্ঠুর নবাবজাদি?"

পান্না অতি বুদ্ধিমতী। সে বুঝিল, শাহজাদা তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু এই পান্না, এ পর্য্যন্ত কাহাকেও ধরা দেয় নাই। সুতরাং সে শাহজাদার কথা শুনিয়া একটু

অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেও। তখনিই সহাস্যমুখে ও সস্মিতবদনে বলিল,—"কে আর নিষ্ঠুর শাহজাদা—সওয়ায় আমার নসীব!"

শাহজাদা পান্নার পার্শ্বে আসিয়া একটী আসন অধিকার করিয়া প্রসন্নমুখে বলিলেন,—"গোপন করিলে চলিবে না, নবাবজাদি! তুমি আমাকে লক্ষ্য করিয়াই ও কথা বলিয়াছ।"

পান্না হঠিবার পাত্রী নয়। সে তাহার মণি খচিত ওড়নার অঞ্চলটী নাড়িতে নাড়িতে, সহাস্য মুখে বলিল,—"যদি আপনাকে লক্ষ্য করিয়াই এ কথা আমি বলিয়া থাকি, তাহা হইলে কি অন্যায় বলিয়াছি—জনাবালি? আপনি আমায় দেখা দিতে এত দেরী করিলেন কেন?"

শাহজাদা পান্নার মুখের দিকে চাহিবামাত্রই বুঝিলেন, একটী খুব সরল সত্য প্রাণের কথা, একটু অসতর্কতাবশে তাঁহার সম্মুখে বলিয়া ফেলিয়া, সে খুবই একটা গোলমালের মধ্যে পড়িয়াছে; তিনি তাহাকে সামলাইয়া দিবার জন্য বলিলেন,—"পান্না! তোমার এ স্নেহের, এ প্রীতির, এ আদরের প্রতিদান কি আমি দিতে পারিব? বোধ হয় নয়। কিন্তু পান্না! যখন আমি এখান হইতে চলিয়া যাইব, তখন তুমি কি করিবে?"

বড় সমস্যাময় প্রশ্ন! এ কথার সত্য উত্তর যাহা হয়, তাহা বলিতে গেলে,—পান্না নিজেই ধরা পড়িবে। আর সেরূপ উত্তরে হয়তো শাহজাদা মনে ভাবিবেন,সে বড়ই নিলর্জ্জা। কিন্তু পান্না, এ টালটাও সামলাইয়া বলিল,—"যাহা হাতের বাহিরে গিয়াছে তার জন্য আর কে আশা করে? অই যে গগনের চাঁদ, এখন

গগন আলো করিয়া আছে—অমাবস্যায় ত ও চাঁদ অইখানে, অত আলো লইয়া, দেখা দিবে না, তবে যাহারা চাঁদের জ্যোতি ভালবাসে, চাঁদকে ভালবাসে, তাহারা কেবল একটু মন মরা হইয়া থাকে মাত্র।”

শাহজাদা ঠিক বুঝিতে পারিলেন না—কথাটা পান্নার অন্তরের--কি কোনও একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় বলিয়া,যেমন দুটো বাজে কথা বলিয়া যাইতে হয়, এটা সেইরূপ কোন কিছু!

ব্যাপারটাকে আরও পরিস্ফুট করিয়া লইবার জন্য, শাহজাদা বলিলেন,—“পান্না! আমি আগামী পরশ্ব তোমাদের এ রাজ-ধানী ত্যাগ করিব।”

কথাটা প্রকৃত। লাহোর হইতে আকবর শাহ এরূপ একটা রুবকারী পাঠাইয়াছিলেন বটে। কিন্তু শাহজাদা, পান্নাকে সে সম্বন্ধে কোন কিছু আভাস দেন নাই। কেন না তিনি জানিতেন, পান্না তাহাতে মনে দুঃখ পাইবে।

পান্না বলিল,—“এত শীঘ্র আমাদের ত্যাগ করিবেন কেন শাহজাদা? আপনার কি এখানে কোন কষ্ট হইতেছে? সত্য বটে, আগরার লোকবিশ্রুত ঐশ্বর্য্য ও বিলাস এখানে নাই, অসংখ্য সুন্দরীপূর্ণ রঙ্গমহলের হাস্যকোলাহল এখানে নাই। সুরূপা ষোড়শীদের বীণ, এসরার ও সুরবাহারের সুরে মিশানো, কোমল কণ্ঠের মধুর সঙ্গীত এখানে নাই, তাহা হইলেও বলিতে পারি, এ দেশের পাহাড়ের স্নিগ্ধশীতল সুখস্পর্শ সমীরপ্রবাহ পাষাণবক্ষভেদী প্রস্রবণের মৃদু কলনাদ, বিটপীশাখায় লুক্কায়িত

শ্যামা, দধিয়াল, পাপিয়ার কলকণ্ঠের অপূর্ব্ব সঙ্গীত, আর আপনার এ বাঁদীর বাঁদী পান্নামতির প্রাণভরা অকৃত্রিম আদর সোহাগ, প্রাণঢালা যত্ন পরিচর্য্যা, এ গুলি বোধ হয় এত প্রচুর ভাবে সেখানে নাই। দিন কতক এখানে থাকিলে ক্ষতি কি শাহজাদা!"

শাহজাদা মৃদু হাস্যের সহিত বলিলেন,—"তোমার এ তীব্র শ্লেষময় তিরস্কারের যোগ্যপাত্র আমি বটে, কিন্তু কি করিব পান্না! আমি যে পরাধীন! পিতার আদেশ—লঙ্ঘন করার শক্তি ত আমার নাই!"

পান্না একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"তাহাহইলে কবে আপনার পুনরায় দর্শন পাইব শাহজাদা?"

শাহজাদা। যে সময়ে, যে কোন প্রয়োজনে, তুমি আমায় স্মরণ করিবে, তোমার হুকুম পাইবামাত্র, আমি এ সুদূর আফজাই মুলুকে আসিয়া উপস্থিত হইব।

পান্না। এতটা অনুগ্রহ করিবেন কি? দিল্লী আগরার রঙ্গমহলের তীব্র কোলাহলের মধ্যে, আমার করুণ আহ্বান পৌঁছিবে কি? সহস্র রাজকার্য্যের ব্যস্ততার মধ্যে, এ অধিনীর কথা মনে থাকিবে কি?

শাহজাদা। নিশ্চয়ই থাকিবে পান্না! আমি যদি নিজেকে ভুলিতে পারি, তাহা হইলে তোমাকেও ভুলিব।

পান্না। তাহা হইলে এখান হইতে প্রস্থানের পূর্ব্বে দাসীর একটী সামান্য অনুরোধ রাখিবেন কি?

শাহজাদা। বল কি করিতে হইবে ?

পান্না। আপনার গৌরবান্বিত পিতা অভিষেকের সময়ে আমাকে বহুমূল্য পোষাক দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। কিন্তু দিল্লীশ্বরের উপযুক্ত নজরানা, আমি এ পর্য্যন্ত কিছুই দিই নাই। আর সেই রাজরাজেশ্বরের সম্মানের উপযুক্ত, দিবার মত কোন কিছুই আমার নাই। তবে যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা সম্রাটকে পৌছাইয়া দিবার ভারটা, আপনাকেই দয়া করিয়া লইতে হইবে ?

শাহজাদা বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে, একবার পান্নার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"সম্রাটের জন্য কি উপহার দিবে বলিয়া মনে সংকল্প করিয়াছ ?"

পান্না বলিল,—"এই স্থানে একটু অপেক্ষা করুন শাহজাদা ! আমি এখনই আসিতেছি।"

এই কথা বলিয়া পান্না দ্রুতপদে তাহার কক্ষ মধ্যে চলিয়া গেল। পান্না না জানি কি এক অপূর্ব্ব উপহার আনিবে, ইহা ভাবিয়া শাহজাদা দানিয়েল, বিস্মিতচিত্তে তাহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

পান্না কিয়ৎক্ষণ পরে, হস্তীদন্ত নির্ম্মিত একটী ক্ষুদ্র বাক্স হাতে লইয়া সেই স্থানে আসিল। সেই বাক্স খুলিয়া তাহা সম্রাটপুত্রের নিকটে ধরিয়া দিয়া বলিল,—"এই গুলিই গৌরবান্বিত বাদশাহ—আকবরের নজরানা। বলিবেন, তাঁহার বাঁদীর বাঁদী, নবাবজাদি পান্না, তাঁহাকে তাহার রাজ্যাভিষেকের

নজরানা রূপে, আফ্জাই পাহাড়ের বুকে লুকানো, এই রত্নগুলি উপহার দিয়াছে।”

সেই হস্তীদন্ত নির্ম্মিত ক্ষুদ্র পেটিকার মধ্যে, কয়েকখানি বহুমূল্য হীরা, পোখ্রাজ নীলা ও পান্না ছিল। শাহজাদা অনুমানে বুঝিলেন—এগুলির মূল্য যদি নিতান্ত কম করিয়াও ধরা যায় ত এক লক্ষ মুদ্রার কম হইবে না।

শাহজাদা বিস্মিতনেত্রে দুই চারি বার সেই বহুমূল্য রত্নরাজি নাড়াচাড়া করিয়া সহাস্য মুখে বলিলেন,—“এ সব বহুমূল্য রত্ন তুমি কোথায় পাইলে পান্না ?”

পান্না মৃদুহাস্যের সহিত বলিল, —“আমার প্রত্যেক জন্ম-দিনে, পিতা আমাকে একখানি করিয়া বহুমূল্য মাণিক উপহার দিতেন। পনর বৎসরের উপহার সংগ্রহ করিয়া, এই গুলি জমিয়াছে।”

শাহজাদা। না—তোমার পিতৃপ্রদত্ত এ স্মৃতিচিহ্নগুলি আমি কোন মতেই লইতে স্বীকৃত নই ?

পান্না। কেন শাহজাদা ?

শাহজাদা। যাহা তোমার ও তোমার পরলোকগত পিতার আত্মার মধ্যে একমাত্র বন্ধন সূত্র—যাহা তোমার পিতার পবিত্র স্মৃতি চিহ্ন, তাহা প্রকারান্তরে কাড়িয়া লওয়া, আমি অতি নিষ্ঠুরতা অতি হৃদয়হীনতার কাজ বলিয়া মনে করি।

কিন্তু পান্না কোন মতেই শাহজাদার এ প্রতিবাদে কর্ণপাত করিল না। অগত্যা শাহজাদা অনিচ্ছার সহিত, সেই উপহার-

গুলি গ্রহণে প্রতিশ্রুতি করিয়া, পান্নার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন।

রাত্রি অধিক হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া পান্না বলিল,—"চলুন জনাব! আমি আপনাকে আপনার কক্ষদ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দিয়া আসি।"

শাহজাদা পান্নার হাত দুখানি ধরিয়া সহাস্য মুখে বলিলেন, "আমার কক্ষের পথ ত আমি চিনি। নবাবজাদী! তোমার আর বৃথা কষ্টের প্রয়োজন নাই।"

দুই জনে তখন বিভিন্নমুখগামী চিন্তাসূত্রে লইয়া, স্ব স্ব কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

ভগবানের সংসারের এক বিচিত্র নিয়মই এই—একই ক্ষেত্রে পাশাপাশি থাকিয়া, একই সময়ে—কেহ বা সুখ কেহ বা দুঃখ ভোগ করে। আবহমানকাল পর্য্যন্ত নিত্য যাহা ঘটিতেছে, তাহার উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন।

পান্না হাওয়া-বারান্দায় একাকিনী আছে এই সংবাদ পাইয়া আফ্‌শান তাড়াতাড়ি ত্রিতলে আসিয়া, একটু দূরে আত্মগোপন করিয়া দেখিল—শাহজাদার সহিত, পান্না বেশ একটু মাখামাখি ভাবে বিশ্রম্ভালাপ করিতেছে।

শয়তানের মূর্ত্তি ধরিয়া, ঈর্ষা তাহার চিত্তক্ষেত্রকে আশ্রয় করিয়া বলিল,—"কি দেখিতেছ তুমি আফ্‌শান? তোমার আশা ভরসা, সবই এই শাহজাদা দানিয়েল চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিতে আসিয়াছে। প্রতিকারের উপায় কি, তাহা আমি তোমায় দেখাইয়া দিব। সেই অনুসারে কাজ করিলে, এই রূপসী শ্রেষ্ঠা পান্না তোমার হইবে। তার রাজ্য তোমার হইবে! তোমার ললাটে অঙ্কিত অস্ফূট ভাগ্যরেখাকে চেষ্টাবলে পরিস্ফুট করিবার শক্তি আমি তোমায় দিব।"

শয়তানের ছলনায় আফশান প্রতারিত হইল। সে অন্তরালে দাঁড়াইয়া পান্না ও শাহজাদার কথাগুলি আদ্যোপান্ত শুনিল; তাঁহার সুপ্ত প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি, শোণিতলোলুপ ব্যাঘ্রের মত আবার জাগরিত হইল। সে সেই মুহূর্ত্তেই শয়তানের দাসত্ব স্বীকার করিল।

পান্না শাহজাদাকে কিয়ংদূর অগ্রসর করিয়া দিয়া আসিয়া, হাওয়া বারান্দায় পূর্ব্বোক্ত মর্ম্মরাসনে বসিল—যাহার উপর সে একদিন এই আফ্‌শানকে অচেতনাবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়াছিল।

আফ্‌শান ধীরপদে অগ্রসর হইয়া একটী ছোটখাট কুর্ণীশ করিয়া বলিল,—"মেজাজ সরীফ্‌! বেগমসাহেবা?"

শাহজাদার রূপে পান্নার হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছিল, শাহজাদার চিন্তা, তাহার বাহ্যিক দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা আনিয়া দিয়াছিল। আর তন্ময়তা তাহাকে জানিতে দিল না—যে আফ্‌শান আসিয়া তাহার খুব নিকটেই দাঁড়াইয়া আছে।

আফ্‌শান বিষের জ্বালায় জ্বলিয়া, অস্ফুট স্বরে কেবলমাত্র বলিল,—"ওঃ—এতদুর !"

একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস, ভীষণ ভ্রুকুটী-ভঙ্গী, তাহার অন্তরের দাবদাহের পরিমাণ যে কত বেশী, তাহা জানাইয়া দিল বটে, কিন্তু পান্না তাহার কিছুই জানিতে পারিল না।

সুতরাং অসহিষ্ণু ভাবে সে তখন পান্নার সম্মুখে আসিয়া বলিল,—"মেজাজ সরীফ্‌! পান্না বেগম !"

পান্না চমকিয়া উঠিয়া বলিল,—"একি ! আফশান ? তুমি এ সময়ে এখানে কেন ?"

আফশান বিরক্তির সহিত বলিল,—"এখানে কি আসিতে নাই পান্নাবিবি! স্বর্গীয় নবাব আমাকে যে স্বাধীনতা দিয়া গিয়াছেন—তাহা কি কাড়িয়া লইতে চাও ?"

পান্না যেন আফ্‌শানের এ কথায় একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল,—"না—না—তা কেন ? তবে রাত্রি অনেক হইয়াছে।"

বিদ্রূপমিশ্রিত স্বরে, আফশান বলিল,—"যেদিন মোগল শাহজাদাকে তুমি কারাগার হইতে উদ্ধার করিয়াছিলে, যেদিন আমি তোমারই কৌশলে অচেতন অবস্থায়, অই মর্ম্মর বেদীর উপর রক্ষিত হইয়াছিলাম, সে দিন ত এর চেয়েও রাত্রে আসিয়াছিলাম পান্না! তবে বলিতে পার, তখন যুদ্ধের সম্ভাবনা ছিল, উপদ্রব অশান্তির ভয় ছিল—আর তোমার এই বান্দার বান্দা আফ্‌শানকেও তখন তোমাদের প্রয়োজন ছিল !"

পান্না আফ্‌শানের এই অতি ধৃষ্টতাপূর্ণ, হৃদয়হীন উত্তরে

বড়ই মর্ম্মব্যথা পাইল। আফ্‌শানের উপর তাহার যে একটু আকর্ষণ ছিল—তাহা তাহার পিতার শোচনীয় মৃত্যুর পর হইতেই কমিয়া আসিতেছিল। সুতরাং মর্ম্মপীড়িতা পান্না রুষ্টস্বরে বলিল,—"তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ আফশান—"

পান্নার বক্তব্য শেষ না হইতেই তাহার মুখ হইতে যেন অবশিষ্ট কথাগুলি কাড়িয়া লইয়া আফশান বলিল,—"না—না পান্নাবেগম! একথা আমি ভুলি নাই, যে তুমি এই রাজ্যের রাজ্যেশ্বরী! একথাও ভুলি নাই—,আমি তোমার বেতনভোগী সেনাপতি ও দাস মাত্র। আর এ কথাও আমি মনে বুঝি, তোমার সামান্য অসন্তোষ, সামান্য বিরক্তি, সামান্য ক্রোধ, এখনি আমাকে পদচ্যুত করিয়া বন্দী করিতে পারে! কিন্তু তবুও বলিব একবার তোমার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি স্মরণ কর পান্না?"

পান্না বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিল,—"আমি তোমার নিকট কোন প্রতিশ্রুতিই ত করি নাই আফ্‌শান!"

আফশান। তাহাই না হয় স্বীকার করিয়া লইলাম! কিন্তু তুমি না করিলেও তোমার স্বর্গীয় পিতা ত করিয়াছিলেন।"

পান্না এ কথায় আরও রুষ্টা হইল। তাহার মুখচোখ লাল হইয়া উঠিল। ধমনীর মধ্যে দ্রুত শোণিত প্রবাহ বহিল। পান্না উত্তেজিত ভাবে বলিল,—"অতীতকে বিস্মৃতির সাগরে ডুবাইয়া দাও। পিতার প্রতিশ্রুতি, পিতার দেহাবসানের সঙ্গেই শেষ হইয়াছে। আর যদিও তিনি প্রতিশ্রুতি করিয়া থাকেন, তাহা করিয়াছিলেন—এক বীর আফ্‌শানের নিকট, যার যৌবনের

উদ্দাম ও শৌর্য্যময় হৃদয়, তাঁহার কার্য্যেই সমর্পিত হইয়াছিল। যে হৃদয়ে ঈর্ষা ছিল না, ছলনা ছিল না, নীচতা ছিল না, বিদ্বেষ ছিল না। কিন্তু সে আফ্‌শানের মৃত্যু হইয়াছে! এখন যে আমার নফর হইয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ধৃষ্টের ন্যায় এই সব মর্ম্মভেদী কথা বলিতেছে, সে সেই বীর আফ্‌শানের ছায়ামূর্ত্তি মাত্র!

আফশান এতক্ষণের পর নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিল। সে মনে মনে ভাবিল—এই বাঘিনীকে ঘাটাইয়া সে খুবই অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিয়াছে। সে এতদিন বুঝে নাই, আজ বুঝিল—প্রেমের পথ বড়ই কণ্টকাকীর্ণ।

সুতরাং সে অনুতপ্তস্বরে বলিল,—"পান্না! পান্না! আমায় মার্জ্জনা কর। আমি তোমার সেই আফশান—যাহার হৃদয়ের চির-আরাধ্য দেবা তুমি। আমি তোমার গোলামের গোলাম সেই আফশান।"

কথার উত্তর দেওয়া দূরে থাক্‌, পান্না আহতা ফণিণীর মত রাগে ফুলিতে লাগিল। সে কোন উত্তরই করিল না।

তখন কৃতাপরাধ ধৃষ্ট আফশান, পান্নার নিকটস্থ হইয়া বলিল, "কই কিছুই ত বলিলে না পান্নামতি আমাকে মার্জ্জনা করা সম্বন্ধে। দাও—তোমার হস্ত দুখানি একবার চুম্বন করিতে! তাহা হইলেও বুঝিব, আমি তোমার মার্জ্জনা পাইয়াছি।"

পান্না ঘৃণার সহিত হাত গুটাইয়া লইল। আফশান প্রীতি ভরে পান্নাকে বুকে জড়াইয়া ধরিতে গেল। পান্না সভয়ে দূরে

সরিয়া দাঁড়াইল। আফশান আবার তাহার কাছে গিয়া বলিল "পান্না! পান্না! মার্জ্জনা কর—আমার সকল অপরাধ।"

অপমানিতা ও লাঞ্ছিতা পান্না, অতি ঘৃণার সহিত আফশান্‌কে সজোরে ধাক্কা মারিয়া সরাইয়া দিয়া দ্রুতপদে সে হাওয়া-বারান্দা ত্যাগ করিল।

আর অপমানিত, লাঞ্ছিত, কুক্কুরের ন্যায় বিতাড়িত আশাভঙ্গে বিকলচিত্ত আফশান, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া বলিল,—"ভাল! বহুৎ খুব! আজ তোমার দিন গেল। কিন্তু যেদিন আমার দিন আসিবে, সেদিন আমি এই হস্তে তোমার সোণারস্বপ্ন একবারে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিব। এ অপমানের প্রতিশোধ লইব।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

মুক্ত প্রকৃতির উপাসক, শাহজাদা দানিয়েল এই পার্ব্বত্য-প্রকৃতির স্নেহাঞ্চলে থাকিয়া, একটা নূতনতর আনন্দ নিত্য উপভোগ করিতেছিলেন। কেন না জনবহুল দিল্লী আগরায়, এ সুখটা ভোগ করিবার বিশেস কোন সুবিধা ছিল না।

অভ্যাস মত, শাহজাদা প্রতিদিন একবার করিয়া পাহাড়ের নিকটস্থ স্থানগুলি ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেন। পান্নার স্বহস্ত রচিত গুলাববাগ, আঙ্গুরের ক্ষেত্র, জাফ্‌রাণের সুগন্ধ ভরা উদ্যান, এ গুলি তাঁহার নিত্য দর্শনীয় বস্তু ছিল। কোন দিন ভ্রমণ

সময়ে তিনি পান্নাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন, কোন সময়ে বা একাকীই যাইতেন।

সেই দিনের অপরাহ্নে, পান্না সাংসারিক কি একটা কার্য্যে খুব ব্যস্ত ছিল বলিয়া, শাহজাদা তাহার অপেক্ষা না করিয়াই একাকী উদ্যান-ভ্রমণে বাহির হইয়া যান।

সূর্য্য তখনও পাটে বসেন নাই। রক্তরাগময় অস্তগামী সূর্য্য-কিরণস্নাত হইয়া, নিকটস্থ গিরিনদীর তীরে এক শিলাতলে বসিয়া শাহজাদা প্রকৃতির পরিবর্ত্তনীয় শোভা দেখিতেছেন, এমন সময়ে এক পাহাড়ী বালক তাঁহার হাতে একখানি পত্র দিল।

এ বালক সম্পূর্ণরূপে তাঁহার অপরিচিত। পত্রখানি তাঁহার হাতে দিয়াই সে তৎক্ষণাৎ অন্তর্দ্ধান হইল। দানিয়েল তাহাকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিবার অবসর পাইলেন না।

পত্রখানি তখনই পাঠ করিয়া তিনি বড়ই বিস্মিত হইলেন। সেই পত্রে লেখা ছিল—"আপনি সম্রাট আকবরের পুত্র। তাঁহার সাহস শক্তি বোধ হয়—আপনাতেও বিদ্যমান। আশা করি, আপনি আজ রাত্রি দুই প্রহরের পর, এই স্থানে অপেক্ষা করিবেন। না আসেন, বুঝিব আপনি অতি ভীরু—অতি কাপুরুষ।"

পত্রে কাহারও স্বাক্ষর নাই। উত্তরবাহক যে—সেও না বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। পত্র পাঠান্তে শাহজাদার মনটা বড়ই খারাপ হইল। তিনি ভাবিলেন—"কে—এ পত্র লেখক? এ গোপনীয় আহ্বানের উদ্দেশ্য কি? এই পাঠান সর্দ্দারেরা সকলেই আত্মীয়তা

প্রকাশে আমার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে। শত্রু ত এ পুরীতে আমার কেহ নাই! তবে কে আমাকে এ ভাবে পত্র লিখিল?"

"আফশান? না—তাহার সহিত আমার ত কোন শত্রুতাই নাই। যদি তাহাকে বন্দীরূপে লাহোরে পাঠাইতাম, তাহা হইলে তাহার প্রাণদণ্ড হইত। তাহা না করিয়া, তাহাকে বিনা দণ্ডে মুক্তি দিয়াছি! পান্নাকে ও সর্দ্দারগণকে অনুরোধ করিয়া, তাহাকে পুনরায় সেনাপতির পদ দিয়াছি। তাহার শত্রুতা করিবার ত কারণ কিছুই নাই।"

সহসা তাঁহার মনে উদিত হইল—"শুনিয়াছি. এই আফশান পান্নাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক। আমি যে কয়দিন এখানে আসিয়াছি, একদিনও তাহাকে এখানে দেখি নাই। অথচ কথা প্রসঙ্গে পান্নার মন বুঝিয়া দেখিয়াছি, সে যেন আফশানকে বিবাহ করিতে ততটা রাজি নয়! হয়তঃ এই আফশানের মনে এরূপ একটা সংস্কার জন্মিয়াছে, যে আমিই তাহার পথে আসিয়া দাড়াইয়াছি। এই জন্য মুখে মিত্র ভাব দেখাইলেও, সে ভিতরে ভিতরে আমার উচ্ছেদ কামনা করিতেছে। যাই হক এ পত্রখানা কার হাতের লেখা, পান্নাকে একবার দেখাইলেই তাহার মীমাংসা হইতে পারে।"

শাহজাদা তখনই সেই নির্ঝরিণীকুল ত্যাগ করিয়া প্রাসাদ মধ্যে তাঁহার নিজের কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। একখানি সোফার উপর বসিয়া, আবার নিবিষ্টচিত্তে সেই পত্রখানি পাঠ করিলেন। তবুও তাঁহার মনের সন্দেহ ঘুচিল না।

এমন সময়ে পান্না, সহসা তাঁহার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল—শাহজাদা, একখানি পত্রের উপর তাঁহার দৃষ্টিসম্বদ্ধ করিয়া রাখিয়া কি ভাবিতেছেন।

পান্না তখনই তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া সহাস্য মুখে বলিল, "হাজার তস্‌লীম এ বাঁদীর—জনাবালি! পত্রখানি কি লাহোর হইতে আসিয়াছে?"

শাহজাদা মুখ ফিরাইয়া মলিন হাস্যের সহিত বলিলেন,—"না—এ পত্র দিল্লীরও নয়, লাহোরেরও নয়। তোমাদের দেশেরই পত্র! অতি অদ্ভুত কথা এতে লেখা আছে!

এই কথা বলিয়া শাহজাদা পত্রখানি পান্নার হাতে দিয়া বলিলেন,—"এ হস্তাক্ষর কার চিনিতে পার কি পান্না?"

দুই তিন বার পত্রখানি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া, পান্না বলিল,—"না—এ হস্তাক্ষর আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত?"

শাহজাদা। আফশানের হস্তাক্ষর চেন কি?

পান্না। খুব চিনি। এ ত তার লেখা নয় জনাবালি!

শাহজাদা সহাস্য মুখে বলিলেন,—"যখন লোকটা এত আদরের সহিত নিমন্ত্রণ করিয়া ফেলিয়াছে, আমাকে ভদ্রতার খাতিরেও অন্ততঃ এ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হইবে। কি বল পান্না বেগম?"

পান্না সবিস্ময়ে বলিল,—"না—না, যাইবেন না শাহজাদা! নিশ্চয়ই এ কোন গুপ্তশত্রুর পত্র! এই পাঠান দলের মধ্যে হয়তো এমন কেউ আছে, যে আপনাকে কোনরূপে বিপন্ন করিতে চায়।"

শাহজাদা। আমি অবশ্য নিরস্ত্র যাইতেছি না। আমি বিশ্বাস করি না যে এ পাঠান দলের মধ্যে আমার কেহ সাংঘাতিক শত্রু আছে!

পান্না। আছে বই কি? আপনি না জানিলে—আমি তাহা জানি। আপনি সেই মিত্ররূপী শত্রুকে সন্দেহ না করিলে আমি করি। সে আর কেউ নয়—নিশ্চয়ই সেই শয়তান আফশান!

শাহজাদা। আফশান! সে আমার অনিষ্ট করিবে কেন? আমি ত তাহার ভালই করিয়াছি।

পান্না। সর্প নিরীহ পথিককে দংশন করে কেন শাহজাদা?

শাহজাদা দেখিলেন, এই সামান্য ব্যাপারটীতে কোন অনাগত অনিষ্টচিন্তায়, পান্নার মুখখানি শুখাইয়া গিয়াছে। তিনি তাহাকে প্রফুল্লিত করিবার জন্য বলিলেন,—"ভাল!—তুমি যখন নিষেধ করিতেছ, তখন না হয় নাই গেলাম।"

সন্ধ্যার পর পান্না, দুই তিন ঘণ্টাকাল শাহজাদার সঙ্গে নানাবিধ কথাবার্ত্তায় কাটাইল। শাহজাদা বলিলেন,—"পান্না বেগম! আমার তবিয়ৎটা আজ ভাল নয়। একটু সকাল সকাল শয্যা আশ্রয় করিতে ইচ্ছা হইতেছে।"

পান্নাও তাহাই চায়। সে শাহজাদার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। তাহার কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র, হিম্মত বলিল,—"এত শীঘ্র চলিয়া আসিলে যে মা!"

হিম্মতকে ইঙ্গিত করিয়া পান্না তাহাকে কক্ষমধ্যে আনিয়া বলিল,—"হিম্মত! শয়তানের মূর্ত্তি কখনও চোখে দেখিয়াছ কি?"

হিম্মত। না—মা, কি করিয়া দেখিব!

পান্না। আমি এই চক্ষে দেখিয়াছি।

হিম্মত। সেকি কথা! আমাদের এই পুরীর মধ্যে নাকি?

পান্না। হাঁ—ঠিক তাই!

হিম্মত। কিছুই ত বুঝিতে পারিলাম না মা! কে সে?

পান্না। সে—আফশান! লাহোরে না পাঠাইয়া যে শাহজাদা তাহাকে আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন—এ সেই শয়তান আফশান!

হিম্মত। বল কি! সে আবার কি করিয়াছে?

পান্না তখন সেই পত্রখানির কথা হিম্মতকে বলিল। হিম্মত সব কথা শুনিয়া বলিল,—"ঠিক্ ধরিয়াছ তুমি! এ পাঠান কুল কূলঙ্কের অসাধ্য কাজ কিছুই নাই! অনেক কারণে তোমায় মা বলিয়া ডাকি। আমি বয়সে বড়, কিন্তু এখন দেখিতেছি মা! তুমি আমার চেয়ে বুদ্ধিতে বড়।

পান্না বলিল,—"হিম্মত! ও সব কথা এখন থাক্। আর ত বেশী সময় নাই! শাহজাদাকে আমি খুবই চিনিয়াছি। তিনি যে আমার কাছ হইতে ঘুমের অছিলা করিয়া আজ সকাল সকাল শয়নকক্ষে চলিয়া গেলেন। তাহাতেই আমার বড়ই সন্দেহ হইতেছে, গভীর রাত্রে নিশ্চয়ই তিনি সেই স্থানে যাইবেন।

হিম্মত। তাহা হইলে উপায় কি? তাঁর কক্ষদ্বারে একটা চাবি দিয়া তাঁর বাহির হইবার পথ আটকাইয়া দিলে হয় না?

পান্না। না—না, তাহাতে হিতে বিপরীত ঘটিবে। তিনি যে এখনও ঘুমান নাই, এ কথা আমি নিশ্চিত বলিতে পারি।

হিম্মত। তাহা হইলে উপায় কি ?

পান্না। আমি এ রাজ্যের রাণী। সেই আফশান এখনও আমার বেতনভোগী সেনাপতি। আমি তাহাকে এখনি বন্দী করিতে চাই। অতি গোপনে গিয়া তুমি দেখিয়া আইস, আফ্-শান তাহার কক্ষে আছে কি না ? যদি থাকে—তাহা হইলে এখনি চারিজন সেনা লইয়া গিয়া তাহাকে বন্দী কর। এই শাহজাদা আজকাল আমাদের অতিথি। অতিথিকে প্রাণ দিয়া রক্ষা করাই পাঠানের ধর্ম্ম। যাও—এখনি যাও। আর বেশী বিলম্ব করিলে সব কাজ মাটী হইবে।

হিম্মত, পান্নাকে একটী ছোটখাট কুর্ণীস করিয়া বলিল,—"তোমার আদেশ এখনই পালন করিতেছি। কিন্তু মা—"

হিম্মতের মনের কথা লুফিয়া লইয়া পান্না বলিল,—"যদি তাকে জীবন্ত না ধরিতে পার! এই তো ? তাহা হইলে, তাহার মৃতদেহ আমায় আনিয়া দেখাইবে! বড় কলঙ্ক হিম্মত! বড় কলঙ্ক! তুমিও ত পাঠান! অতিথিকে হত্যা করিবার চেষ্টা কি কখনও কল্পনায় ভাবিতে পার ?"

হিম্মত আর কিছু না বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেইস্থান ত্যাগ করিল। এই হিম্মত খাঁ সমস্ত মহলের প্রধান রক্ষক। তার তাঁবেদারীতে পুরীরক্ষক পঞ্চাশজন সেনা। হিম্মত তাহাদের মধ্যে চারিজনকে বাছিয়া লইয়া, গুলাববাগের উত্তরদিকে অবস্থিত

আফশানের আবাস বাটীতে উপস্থিত হইল। আফশানের পার্শ্বচর এক গোলামকে দেখিয়া হিম্মত বলিল,—"তোমার প্রভু কোথায় ?"

গোলাম বলিল,—"তা ঠিক জানি না। তবে সন্ধ্যার পরই তিনি মহলের বাহির হইয়া গিয়াছেন।"

হিম্মত। ভাল! তুমি তাঁহাকে বলিও, নবাবজাদী তাঁহাকে সেলাম দিয়াছেন। ব্যাপার বড়ই জরুর।"

হিম্মতকে প্রত্যাবৃত্ত দেখিয়া পান্না আগ্রহ ভরে প্রশ্ন করিল,— "তুমি একা ফিরিয়া আসিলে যে ? আফশান কোথায় ?"

হিম্মত বলিল,—"তাহার কোন সন্ধান পাইলাম না। তাহার গোলাম বলিল—সন্ধ্যার আগে সে বাটীর বাহির হইয়া গিয়াছে।"

পান্না একটু চঞ্চলভাবে বলিল,—"এখনও সময় আছে। বাছিয়া বাছিয়া চারিজন পাঠান সেনা সঙ্গে লও। চল হিম্মত! এখনই আমরা প্রাসাদের বাহির হইয়া যাই। এর পরের কর্ত্তব্য যাহা—তাহা তোমাকে পথিমধ্যে বলিব।"

এমন একটা দৃঢ়তার সহিত, পান্না তাহার এই হুকুম হিম্মতের উপর জারি করিল, যে হিম্মত আর কোন কিছু প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না।

কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া কিয়ৎকালব্যাপী চিন্তার পর, শাহজাদা স্থিরসংকল্প করিয়া ফেলিলেন—এ আহ্বানকারী যেই হোক না কেন, একবার তাহাকে দেখিতে হইবে। এজন্য রাত্রি দ্বিতীয়

প্রহরের প্রারম্ভে তিনি নিঃশব্দপদসঞ্চারে তাঁহার কক্ষের বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন পুরীর মধ্যে সকলেই সুপ্ত। গভীর নিশুতি চারিদিকে। তৎপরে পুরীর বাহির হইয়া, পান্নার গুলাব উদ্যানের মধ্যে আসিলেন। একবার পান্নার কক্ষের দিকে দৃষ্টি-পাত করিলেন। দেখিলেন—সে কক্ষের দীপালোক সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত।

তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত চিত্তে, পাহাড়ের পথ ধরিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন। নিম্ন ক্ষেত্রই সমতল। এই সমতল ক্ষেত্রে পৌঁছাইবার পর শাহজাদা চারিদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন—কেহই সেখানে নাই। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"কে কোথায় আছ? সম্মুখে আইস।"

সেই আহ্বানবাণী শুনিয়া আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত এক পুরুষ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কাছে আসিয়া তাহার মুখের আবরণ মোচন করিল। একটু বিদ্রূপমিশ্রিত স্বরে বলিল, "বন্দেগি—শাহজাদা!"

শাহজাদা সবিস্ময়ে দেখিলেন—আফশান তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। পান্নার সন্দেহই ঠিক।

শাহজাদা ঘৃণাপূর্ণ স্বরে বলিলেন,—"তুমিই আমায় পত্র লিখিয়াছিলে?"

"হাঁ—জনাব!"

"কি প্রয়োজন?"

"আমার এ প্রয়োজন বড়ই গুরুতর।"

"হইতে পারে। প্রাসাদেও ত আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারিতে।"

"তাহাতে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিত।"

"ভাল—এইখানেই তোমার বক্তব্য কি, আমায় বলিতে পার।"

আফশান বলিল,—"আমার পশ্চাৎবর্ত্তী হউন। একটু নির্জ্জন স্থান চাই আমি।"

বিস্ময় ব্যাকুল চিত্তে, শাহজাদা আফশানের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। পাঁচ মিনিট পরে, তাঁহারা এক ক্ষুদ্র বনভূমির মধ্যে উপস্থিত হইলেন। তন্মধ্যস্থ এক বিশাল বৃক্ষতলে গিয়া আফশান স্থিরভাবে দাঁড়াইল।

শাহজাদা বলিলেন,—"তোমার বক্তব্য কি এইবার বল!"

আফশান বলিল,—"আমার বক্তব্য অতি কঠোর! আপনি আমার স্বার্থের পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আমি সে পথ মুক্ত করিতে চাই।"

শাহজাদা। তোমার স্বার্থের সহিত, আমার স্বার্থের কোন সম্বন্ধই নাই? আমিই কৃপাবশে অনুরোধ করিয়া তোমায় আবার সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি।

আফশান। সেটা অতি ক্ষুদ্র স্বার্থ। সে স্বার্থ পূর্ণ না হইলে আমি তিলমাত্র দুঃখিত হইতাম না।

শাহজাদা। তোমার মহাস্বার্থটা কি শুনি?

আফশান। এই নবাবজাদী পান্না!

শাহজাদা। পান্নার সহিত আমার সম্বন্ধ কি? পান্নার মত সহস্র রূপসী আমার আগরার রঙ্গমহলে আছে। পান্নাকে প্রয়োজন হইলে, বন্দিনী রূপে আমি এখনও তাহাকে লাহোরে পাঠাইতে পারি। এ রাজ্য পুনরায় অধিকার করিতে পারি।

আফশান। আপনি আপনার দিক দিয়া কথাটা বিচার করিতেছেন। কিন্তু আমার দিক দিয়া আমি এ কথাটা অন্য ভাবে বিচার করিয়াছি। হইতে পারে, পান্নার রূপের ছায়া আপনার হৃদয়ে ব্যাপ্ত হয় নাই—হইতে পারে, আপনি পান্নাকে ভালবাসেন না। কিন্তু আমি জানি, সে আপনাকে ভালবাসে।

শাহজাদা। সেটা কি আমারই অপরাধ?

আফশান বলিল,—"প্রত্যক্ষ না হইলে পরোক্ষ বটে। শাহজাদা! আমি আপনাকে দ্বন্দ-যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি। দুই জনের এক জনকে আজ এ দুনিয়া হইতে সরিতেই হইবে। তাহা না হইলে—"

শাহজাদা এই কথায় একটু চমকিয়া উঠিয়া, আফ্‌শানের মুখের দিকে চাহিলেন। দেখিলেন—তাহার নেত্রদ্বয় জ্বলিতেছে। হিংস্র ব্যাঘ্র, তাহার শিকারকে আক্রমণের পূর্ব্বে যেরূপ ক্রুদ্ধ ভাবে তাহার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে, আফ্‌শানের এ দৃষ্টি যেন সেইরূপ।

আফ্‌শানের এ ধৃষ্টতায়, শাহজাদা মর্ম্মেমর্ম্মে জ্বলিয়া উঠিলেন। তাঁহার চোখের সম্মুখে তখন মোগলের অধিকৃত

বিশাল হিন্দুস্থান যেন জীবন্ত মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিল। আগরার মণিময় রাজসিংহাসন,আর সেই সিংহাসনে উপবিষ্ট তাঁহার পিতা, তৎপার্শ্বে হীরকমুকুটশোভিত শতসহস্র বীরসেনানী ও রাজন্যবর্গ পরিবৃত, দেওয়ানখাসের সমুজ্জ্বল দৃশ্য যেন সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। রঙ্গমহলের হীরকালঙ্কারমণ্ডিতা, শত শত রূপসী হারেমবাসিনী, যাহাদের কাছে পান্না বাঁদীরূপে দাঁড়াইবার যোগ্যা নয়, একথাও মনে পড়িল। যে বাদশাহী রঙ্গমহলের ঐশ্বর্য্যের একাংশ ব্যয় করিলে, এরূপ শত শত ক্ষুদ্র পাঠান রাজ্য সৃজিত বা চূর্ণীকৃত হইতে পারে, সেই ক্ষুদ্র পাঠান রাজ্যের নগণ্য সেনাপতি আফশান খাঁর এত বড় স্পর্দ্ধা, সে দিল্লীশ্বরের পুত্রের সম্মুখে এতটা বেয়াদবেরমত কথা কহে ?

শাহাজাদা ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—"শয়তান! কৃতঘ্ন! তোর মত কুক্কুরের সঙ্গে অসিযুদ্ধ করিতে দিল্লীশ্বরের পুত্র, শাহজাদা দানিয়েল বড়ই অগৌরব বোধ করেন।"

আফশান ঘৃণাপূর্ণ এ তিরষ্কার বাণীতেও হঠিল না। সে তখনিই তাহার অসি কোষবিমুক্ত করিল। শাহজাদার মস্তক লক্ষ্য করিয়া আঘাত করিবার উদ্যোগ করিতেছে,—এমন সময়ে সহসা তাহার পশ্চাৎ দিক হইতে এক বৃদ্ধ পাঠান সৈনিক সবলে আফশানের দক্ষিণ হস্তের কবজী চাপিয়া ধরিল। আফশান—তাহার প্রচণ্ড শক্তিতে অধীর হইয়া পড়িল।

সেই সঙ্গে সঙ্গে—স্ত্রীকণ্ঠে কে যেন একজন তখনই হুকুম করিল "তোমরা এই শয়তান আফশান খাঁকে এখনি বন্দী কর।

আমি এ রাজ্যের রাণী। যদি উহাকে জীবন্ত না ধরিতে পার এখনিই হত্যা কর!"

শাহাজাদা দানিয়েল ও আফ্‌শান উভয়েই সেই কণ্ঠস্বর চিনিলেন। শাহজাদা দানিয়েল বিস্মিতনেত্রে বলিলেন—"একি! নবাবজাদি! তুমি এখানে আসিলে কেন?"

শাহজাদার সম্মুখে অবনত হইয়া বসিয়া পড়িয়া পান্না কম্পিত স্বরে বলিল—"আসিয়াছি—কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করিতে, আসিয়াছি—এই আতিথ্যপরায়ণ পাঠানজাতিকে, অতিথিহত্যার ঘৃণিত কলঙ্কমুক্ত করিতে। আসিয়াছি—রাজ্যেশ্বরীর প্রথম আধিপত্যের পরিচয় দিয়া এই পাঠান কুলকলঙ্ক আফ্‌শানকে শাস্তি দিতে।"

আর বেশী কিছু না বলিয়া পান্না রুষ্টস্বরে হিম্মতকে বলিল—"আর কোন কথার প্রয়োজন নাই। আমার বেতনভোগী গোলামের গোলাম যে—এত স্পর্দ্ধা তার! তোমরা ইহাকে কারাগারে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখ। অবসর মতে, কাল কি পরশু শাহজাদা দানিয়েল নিজেই এই শয়তান আফ্‌শানের বিচার করিবেন।"

পান্নার আদেশে প্রহরীরা তখনই আফ্‌শানকে বন্দী করিয়া কারাগারে লইয়া গেল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

কি করিয়া কিসে কি হইল, তাহা বোধ হয় পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে না। কিন্তু এই ঘটনার পর হইতে পান্নার মনটা বড়ই দমিয়া গেল। সে মনে মনে ভাবিল, যাঁর উদারতা ও হৃদয়ের মহত্ত্বের জন্য আজ এই পাঠান রাজ্য ধ্বংশমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছে, তাঁহার সহিত এই বিশাসঘাতকতা? এ কলঙ্ক, আফ্‌শানের নয়, আফ্‌জাই রাজ্যের রাণীরও নয়---সমগ্র পাঠান রাজ্যের।

সেই মধ্যাহ্নে, সওয়ার ডাকে -- লাহোর হইতে শাহজাদা দানিয়েল, তাঁহার গৌরবান্বিত পিতা সম্রাটের এক জরুর পত্র পাইলেন। সে পত্রে লিখিত ছিল—"আফজাই রাজ্যের সমস্ত বন্দোবস্ত শেষ করিয়া, শীঘ্রই লাহোরে চলিয়া আসিবে।"

শাহজাদা তখনই শমসের খাঁকে ডাকিয়া হুকুম দিলেন "সমস্ত সৈন্য ঠিক করিয়া রাখ। কাল প্রভাতেই আমরা কুচ্ করিব।"

সমশেরকে বিদায় দিয়া, শাহজাদা নিজের চিন্তায় বিভোর হইলেন। সেদিন প্রভাত হইতে পান্নার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। শাহজাদা বুঝিলেন, গত রাত্রে শয়তান আফ্‌শানের কৃতকার্য্যের জন্য, হয়তঃ লজ্জায় পড়িয়া পান্না তাঁহার সহিত দেখা করিতে সাহস করিতেছে না।

মধ্যাহ্ন কাটিয়া গেল। তবুও পান্নার কোন খোঁজ খপর নাই। অগত্যা শাহজাদা তাহার সংবাদ লইবার জন্য নিজেই

অগ্রসর হইলেন। উন্মুক্ত কক্ষদ্বার দিয়া নিঃশব্দে তাহার কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তিনি পান্নার পিছনে গিয়া দাঁড়াইলেন।

পান্নার সম্মুখে একখানি উন্মুক্ত চিত্র। এ ছবিখানি শাহজাদা দানিয়েলের-প্রতিমূর্ত্তি। হস্তীদন্তের উপর এই চিত্র অঙ্কিত। পান্নার অভিষেকের সময়, শাহজাদা তাহাকে এই ছবিখানি স্মৃতিচিহ্নরূপে উপহার দিয়াছিলেন।

পান্না জানিতে পারে নাই—যে শাহজাদা তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এতটা বিভোর, এতটা তন্ময়, সে তখন নিজের চিন্তায়। কিয়ৎক্ষণ একদৃষ্টে ছবিখানি দেখিবার পর, সে তাহা তাহার বুকের মধ্যে খুব সজোরে চাপিয়া ধরিয়া, একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আঃ—কি তৃপ্তি! আঃ—এ জ্বালাময় প্রাণে কি—শান্তি! অতি সুন্দর তুমি! কিন্তু তুমি অতি নিষ্ঠুর!"

পান্নার এই অবস্থা দেখিয়া প্রকৃত ব্যাপারটী যে কি, তাহা বুঝিতে শাহজাদার বেশী বিলম্ব হইল না। তিনি তাহার ধ্যান ভঙ্গ করিবার জন্য সহসা পিছন হইতে বলিয়া উঠিলেন—"কে নিষ্ঠুর! নবাবজাদী?"

এ কণ্ঠস্বর যে শাহজাদার! কি সর্ব্বনাশ! তবে কি তিনি সবই জানিতে পারিয়াছেন? আমি কি কক্ষের দ্বার বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম!

প্রত্যুৎপন্নমতিশালিনী পান্না তখনই ছবিখানি বাম হাতে চাপিয়া রাখিয়া বলিল—"আপনিই অতি নিষ্ঠুর! আর কে?

আপনাকে দেখিলে মনে পড়ে, সৌন্দর্য্য আর নির্ম্মমতা যেন পাশাপাশি বাস করিতেছে।

শাহজাদা। কেন পান্নামতি? আমার কি অপরাধ?

পান্না। আপনি কেন আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন?

রহস্য করিবার উদ্দেশ্যে শাহজাদা মৃদুহাস্যের সহিত বলিলেন,—"বড়ই ভয় হইতেছে যে যদি তোমার এই প্রাসাদ মধ্যে দ্বিতীয় আফশানরূপে আর কেউ বাহির হইয়া পড়ে।"

এ রহস্যের কথাতেও, পান্না যেন মরমে মরিয়া এতটুকু হইয়া গেল। সে নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তার স্রোতে হাবুডুবু খাইতেছিল, কিন্তু এইভাবে বিদ্রূপের শাণিত অস্ত্রে আহত হওয়ায়, সে আফ্-শানের উপর বড়ই ক্রুদ্ধ হইল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"হাঁ ভাল কথা! এই শয়তান আফ্শানের বিচারভার যে আপনার উপর?"

শাহজাদা। কেন, এ আফ্জাই রাজ্যের নবাভিষিক্তা রাণী যিনি,—তিনি কি তার বিচারে অক্ষম!

পান্না। আপনি বর্ত্তমানে, সে রাণী আপনার ছায়া মাত্র। দাসী মাত্র!

শাহজাদা। যদি তাই হয় পান্না! তাহা হইলে আফ্শানের বিচার আমি বহু পূর্ব্বে করিয়া রাখিয়াছি।

পান্না। আপনার দণ্ডাজ্ঞা কি শুনিতে পাই না জনাব!

শাহজাদা। আফ্শানকে কাল প্রভাতেই কারা মুক্ত করিয়া দাও।

পান্না। সে কি? সে ঘোর শয়তান! সে আপনাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল যে হুজুরালি!

শাহজাদা। খোদা না মারিলে, কার সাধ্য মৃত্যু ঘটায় নবাবজাদি! আমার বিচারে—অতি কৃতঘ্ন যে—তাহার প্রকৃত শাস্তি মার্জ্জনা। অতি শয়তান যে—তাহার শাস্তি অতি মাত্রায় করুণা। মানুষ ভ্রমে পড়িয়া কি না করে? জগতের সমস্ত অপরাধই ত একটা না একটা ভ্রমের ফল। আমার বিচারে এই সব ভ্রমসূচিত অপরাধের প্রকৃত দণ্ড মার্জ্জনা—উপেক্ষা—করুণা।"

পান্না শাহজাদার মুখের দিকে এক দৃষ্টে থাকিয়া, কি একটা উত্তেজনা বশে, তাহার দক্ষিণ হস্তখানি চাপিয়া ধরিয়া আগ্রহের সহিত বলিল—"এতদিন মোগলকে চিনিতে পারি নাই, আজ চিনিয়াছি। পাঠান—অপরাধ, মোগল—ক্ষমা। পাঠান—ধ্বংশের মূর্ত্তি,—মোগল প্রতিষ্ঠার দেবতা। প্রমাণ এই অকৃতজ্ঞ পাঠান, আফ্‌শান খাঁ—আর মোগল রাজকুলের সমুজ্জ্বল রত্ন আপনি!"

পান্না আর বলিতে পারিল না। ভাবের উচ্ছ্বাসে সে কাঁদিয়া ফেলিল।

শাহজাদা দ্রুত স্পন্দিত হৃদয়ে, পান্নার সুকোমল হাত দুখানি স্নেহভরে নিপীড়িত করিয়া, বাদশাহের আদেশপত্র দেখাইয়া বিদায় লইলেন। পান্না, বিষণ্ণমুখে দুঃখভারাবনত হৃদয়ে তাঁহাকে দ্বার পর্য্যন্ত অগ্রসর করিয়া দিয়া আসিল। শাহজাদার চোখেও জল!

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

শাহজাদার অনুরোধ রক্ষা করিয়া, পান্না অবশ্য আফ্‌শানকে মুক্তি দিয়াছিল। কিন্তু তাহার পর আফ্‌শান যে কোথায় গা ঢাকা দিল—পান্না তাহার কোন সন্ধানই পাইল না। সেজন্য সে একটুও দুঃখিত নহে!

শাহজাদা মীরণগড় হইতে চলিয়া যাওয়ার পর দুই সপ্তাহ কাটিয়া গেল। পক্ষের পর-মাস কাটিল। কিন্তু তবুও পান্নার মনে তিলমাত্রও শান্তি নাই।

সব যেন তাহার চক্ষে শূন্য। সে ভাবে, চাঁদ হইতে যেন আলোক ঝরিয়া পড়িয়াছে, নক্ষত্র হইতে জ্যোতিঃ খসিয়া পড়িতেছে—পাখীর গান হইতে যেন কাকলী ঝরিয়া পড়িতেছে। আর তাহার চিত্তের মধ্যে যে অতি পবিত্র আশার আলোকটী ক্ষীণভাবে জ্বলিতেছিল, তাহার দীপ্তি যেন দিনে দিনে কমিয়া আসিতেছে। নির্ব্বাণের আর বেশী দেরী নাই।

পান্না কাহারও সহিত বড় একটা দেখাশুনা করে না। সে সর্দ্দারদের উপর রাজ্যের সকল ভার সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে। রাজ্য তখন শান্তি পূর্ণ—কাজও একরকম চলিয়া যাইতেছে।

মীরণগড়ের প্রাসাদকক্ষ তাহার চক্ষে বড়ই শোচনীয় স্মৃতি পূর্ণ। যে কক্ষে তাহার পিতা আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, সে কক্ষে সে আর যায় না। শাহজাদা যে কক্ষে থাকিতেন, সে কক্ষমধ্যে প্রবেশের তাহার কোন ইচ্ছাই হয় না।

সেই পূর্ণ যৌবনের ঢলঢলায়মান সৌন্দর্য্য, যেন সূর্য্যাতপ পরিদগ্ধ বনকুসুমের মত দিনে দিনে শুখাইয়া যাইতেছে। তাহার চোখের কোলে কালি পড়িতেছে। মুখ হইতে সেই আগেকার দীপ্তিময় লাবণ্যটা, যেন দিনে দিনে ঝরিয়া পড়িতেছে।

অসংখ্য বহুমূল্য সাঁচ্চা-খচিত পোষাকে তাহার সুবৃহৎ পেটিকাগুলি পরিপূর্ণ, কিন্তু সে তাহার কিছুই পরে না। অতি উৎকৃষ্ট ইস্তাম্বুলের তৈয়ারি, গন্ধভরা জুঁই চামেলি, মতিয়া ও হেনা ও খস্‌খস্‌ গোলাপের আতর তাহার বাক্সের মধ্যে পচিতেছে হায়! কেইবা বা তাহা মাখে!

তাহার আহারে রুচি নাই, নিদ্রায় শান্তি নাই, উপত্যকার শ্যামচ্ছায়ায় ভ্রমণের প্রবৃত্তি নাই, নির্ঝর জলে বসিয়া পাখীর গান শুনিবার বাসনা নাই—সে যেন কি এক রকম হইয়া গিয়াছে। তাহার আদরের গুলাববাগে আগাছা জন্মিতেছে, সখের আঙ্গুর ক্ষেত—জলের ও যত্নের অভাবে শুকাইয়া যাইতেছে। কোন দিকেই তাহার দৃষ্টি নাই।

পান্না নির্জ্জনে বসিয়া দিনরাতই ভাবে,—"কেন না বুঝিয়া রত্নের আশায় অকুল সমুদ্রে ডুবিলাম! আমার আদরের আকাঙ্ক্ষার রত্ন এখন কার কণ্ঠে শোভা পাইতেছে? কি সৌভাগ্য করিলে লালা-রুখ্‌ বেগম হইয়া জন্মান যায়? কোন পুণ্য ফলে, রঙ্গমহলে রাণীগিরির অধিকার জন্মে?"

কি সৌম্য, শান্ত, স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় রূপ তাঁর! কি সুন্দর মিষ্ট কথাগুলি তাঁর! আস্যের, হাস্যের, অধরের, অন্তরের

কি প্রফুল্লভাব তাঁর! হৃদয় তাঁর কত উদার—কত মহৎ।"

"হায়! কেন লজ্জা আসিয়া আমার কণ্ঠ চাপিয়া বসিল? কেন আমি তাঁহার কণ্ঠলগ্ন হইয়া বলিলাম না—"তুমি আমার সর্ব্বস্ব। আমার ইষ্ট—অভীষ্ট সবই যে তুমি। আমার আশা আনন্দ উৎসাহ, জীবনীশক্তি, অন্ধকারভরা মর্ম্মস্থানের উজ্জ্বল আলোক যে তুমি!

কত সুখে এখন তুমি আগরার রঙ্গমহলে বিরাজ করিতেছ প্রিয়তম! যে আলিঙ্গনের প্রত্যাশা আমি করিতেছি, তাহা অপরে পাইতেছে। যে হাসি দেখিলে আমি সুখী হইতাম, তাহা অপরে দেখিতেছে! যে মিষ্ট কথা শুনিতে আমার আগ্রহ—তাহা অপরে শুনিতেছে!

দোষ আমার। তোমার নয়। দোষ আমার রমণী হৃদয়ের, কর্ণের, নেত্রের, আসঙ্গলিপ্সার। তাহাহইলেও কি তুমি আমায় মার্জ্জনা করিবে না!

পান্না যখন একাকিনী থাকে, তখন দিন রাতই সে এইরূপ ভাবনা ভাবে। ক্রমশঃ মীরণগড়ের প্রাসাদ তাহার চক্ষে বড়ই বিরক্তিকর ও জ্বালাময় হইয়া উঠিল। সে "দিল—পসন্দ" নামক উদ্যান বাটীতে চলিয়া গেল।

সে উদ্যান বাটিকা, একটী ক্ষুদ্র রাজ-প্রাসাদ। সুন্দররূপে সাজানো—আর স্থানটী খুব নির্জ্জন! কিন্তু প্রাণে যার জ্বালা তার সুখ শান্তি স্বর্গে থাকিলেও নাই।

এ উদ্যান বাটীতে তাহার সঙ্গে আসিয়াছে বাঁদী মুনিয়া, আর শরীররক্ষীরূপে মহলের প্রধান প্রহরী—হিম্মত খাঁ।

পান্না, একদিন একা তাহার নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া ভাবিতেছে, এ ভাবে এ জ্বালা আর কতদিন সহিব? লোকে সুখের আশায় সংসারে থাকে। কি সুখ আমার আছে? আশার আলো পথ দেখাইয়া দেয়,—মানুষ সেই পথে চলে। আমার আশাদীপ ত সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত—পথও অন্ধকারময়!

আজ কাল পান্না মুনিয়ার সঙ্গে আর তেমন করিয়া প্রাণ খুলিয়া কথা কহে না। তাহার সহিত সেরূপ ভাবে হাস্যপরিহাস করে না। মুনিয়াও সেটা খুব ভালরূপ লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে, কিন্তু পান্নার মনের অবস্থা বুঝিয়া কোন কথাই বলে না।

মুনিয়া ধীর গতিতে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল পান্না—আকাশের দিকে দৃষ্টিসম্বদ্ধ রাখিয়া একমনে কি ভাবিতেছে। সে মৃদুস্বরে পশ্চাৎ দিক হইতে ডাকিল—"নবাবজাদি!"

পান্না তাড়াতাড়ি তাহার চোখের জল মুছিয়া বলিল,—"কেন? কি প্রয়োজনে এখন আমাকে জ্বালাইতে আসিলি, মুনিয়া?"

মুনিয়া। তুমি এখন কাঁদিতেছিলে কেন?

পান্না। ভাগ্য কাঁদাইতেছে, তাই কাঁদিতেছি।

মুনিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পান্নার পাশে বসিয়া তাহার অশ্রুধারা মুছাইয়া দিয়া সস্নেহে বলিল,—"দিনরাত অমন

ভাবে হা-হুতাশ করিলে কি আশার জিনিষ পাওয়া যায়? যাতে পাওয়া যায় তাই কর।"

পান্না। কি করিব? কে সে উপায় আমায় বলিয়া দিবে?

মুনিয়া। আমি দিব!

মুনিয়াকে, পান্না নিজের সহোদরার মত ভালবাসিত। এই মুনিয়ার মা'ই পান্নার ধাত্রী ছিল। পান্না মুনিয়ার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—"কি উপায় দেখাইবি তুই?"

মুনিয়া। দেখ বহিন্! এখন বুঝিতেছি, রাজা না থাকিলে রাণীগিরির গর্ব্ব নাই, সুখ নাই, আনন্দ নাই। যখন কিছুই তোমার ভাল লাগে না—দিনরাত ভাবনায় চিন্তায়, কাঁদিয়া-কাটিয়া হা-হুতাশে দিন যাইতেছে— তখন যেখানে গেলে একটু শান্তি পাও, সেখানে যাই চল!

পান্না। কোথায় সে স্থান? মৃত্যুর পরপারে?

মুনিয়া। মৃত্যুর না হউক—রাভি নদীর অপর পারে বটে।

পান্নার মুখ সহসা উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিল। কিন্তু পরক্ষণেই সে মলিন মুখে বলিল,—"সঙ্গে যায় কে?"

মুনিয়া। আর কে যাবে বহিন্! এই মুনিয়া পোড়ার-মুখীই তোমার সঙ্গে যাইবে?

পান্না। হিম্মত সঙ্গে থাকিবে না?

মুনিয়া। নিশ্চয়ই।

পান্না। কিন্তু সে কি রাজি হইবে!

মুনিয়া। তোমার হিতার্থে সে জীবন দিতে পারে।

সেই নিজেই আমার কাছে সেদিন এইরূপ একটা প্রস্তাব করিতেছিল।

পান্না। তাহা হইলে গোপনে রাজ্য ত্যাগ করিয়া যাইব কেন? প্রকাশ্যে গেলেই ত হয়।

মুনিয়া। না—তাহাতে অনেক বিপদ! জান তুমি—সেই শয়তান আফশান এখনও জীবিত।

আফশানের নাম শুনিয়াই পান্না মর্ম্মে মর্ম্মে শিহরিয়া উঠিল। তারপর চেষ্টা করিয়া একটু সামলাইয়া লইয়া বলিল,—"সে আমার কি করিবে?"

মুনিয়া। শয়তানের অসম্ভব কাজ কিছুই নাই! আমার বিশ্বাস, সে এ আফজাই রাজ্য ত্যাগ করে নাই।

পান্না কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া বলিল,—"না—যাইব না।"

মুনিয়া। কেন—আফশানের ভয়ে নাকি?

পান্না। দূর তা কেন? ভাবিতেছি—বিনা আহ্বানে, বিনা নিমন্ত্রণে, যাওয়াটা কি ভাল?

মুনিয়া। ওঃ—পোড়াকপাল! যাহার অভাবে মরিতে বসিয়াছ, সে কবে ডাকিবে—তবে তুমি যাইবে? ভালবাসা যেখানে, বিরহের ব্যাকুলতা যেখানে, সেখানে কি অত মান অভিমানের অভিনয় চলে?

পান্না মনে মনে ভাবিল, মুনিয়া যেন তাহার মনের কথাগুলি টানিয়া বলিয়াছে। তারপর আবার কি একটা মনে মনে ভাবিয়া, একটী মর্ম্মভেদী ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পান্না বলিল,—

"যদি এতটা করিয়াও আশা পূর্ণ না হয়? আগরার রঙ্গমহলে স্থান না পাই?"

মুনিয়া সহাস্যমুখে, বিদ্রূপচ্ছলে বলিল,—"রাভি নদীতে অনেক জল আছে। সেখানে ত তোমার স্থানাভাব হইবে না।"

তারপর দুজনে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। শাহজাদাকে এ সম্বন্ধে পত্র লেখাও হইয়া গেল। ফল কি হইল, তাহা পরে প্রকাশ পাইবে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

শাহজাদা দানিয়েলের করুণার ফলে, আফশান দ্বিতীয় বার বন্দীত্ব মুক্ত হইয়া মনে বড়ই একটা ধিক্কার অনুভব করিল।

শয়তান চিরকালই—শয়তান। সুতরাং কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে সে কৃতঘ্নতাকে আশ্রয় করিল। তাহার মনে কেমন একটা অন্ধ বিশ্বাস জন্মিল যে, শাহজাদার স্মৃতি জাগ্রত থাকিতে পান্নাকে পাইবার কোন আশাই তার নাই। আর যে কোন উপায়ে হউক, এই পান্নাকে আয়ত্ত করিতে না পারিলে তাহার ষোলআনা জীবনটাই মাটি হইয়া যাইবে। সে ভাবিল, সহজে না হয়, পাশব শক্তির সহায়তায় এই পান্নাকে আয়ত্তাধীন করিব।

কিয়ংক্ষণ এইভাবে চিন্তা করিয়া আফশান পান্নার কক্ষের দিকে একবার উন্মাদের মত বিকট দৃষ্টি করিল। দেখিল—সে কক্ষের আলোকরাজি তখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই।

সে মনে ভাবিল, ঐ কক্ষে ত পান্না আছে! কিন্তু ওখানে প্রবেশের পথ যে আমার রুদ্ধ। সত্যই ঐ পান্না কি এতই শক্তিময়ী—এতই গৌরবময়ী? তার দর্প কি চূর্ণ করিতে পারিব না?

মনের অবস্থাটা খুব খারাপ হওয়ায়, পান্না আজকাল মীরাণগড় ছাড়িয়া "দিল্‌পসন্দে" আসিয়াছিল। বাগানটী অতি নির্জ্জন। খুবই চিত্তারামপ্রদ—প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। আগে বলিয়াছি, তাহার সঙ্গে ছিল মুনিয়া ও হিম্মত। বেশী বাঁদী দাসী এ উদ্যান বাটীতে ছিল না। তবে অবশ্য দুই চারি জন প্রহরী তাহার পুরীর দ্বার রক্ষা করিত।

এই দিল্‌পসন্দের পশ্চাতে একটি ক্ষুদ্র গিরিনদী। আফশান চোরের মত একখানি ক্ষুদ্র নৌকায়, এই নদী পার হইয়া এক গুপ্ত দ্বার দিয়া উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি। তবুও সে স্থান ত্যাগ করিল না। অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল—উৎসুকচিত্তে সে যেন তথায় কাহারও জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

সহসা একজন আপাদমস্তক আবৃত করিয়া পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষতলে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল,—"আসিয়াছেন জনাব?"

আফশান একটু বিরক্তির সহিত বলিল,—"এত দেরী করিলে কেন জুলেখা?"

জুলেখা বলিল,—"খুসখবর কোন কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইলে, একটু বিলম্ব ত হইতেই পারে।"

আফশান আগ্রহের সহিত বলিল,—"সত্য বল খবর কি ?"

জুলেখা। খপর মন্দের ভাল। কাল আপনার বাড়ীতে গিয়া একটা খপর দিয়া আসিয়াছি, যে পান্নাবেগম বোধ হয় শীঘ্রই লাহোরে শাহজাদার কাছে যাইবে।

আফশান। কিন্তু যাইবে কবে ? তাহা হইলে যে আমার পথ খুবই পরিষ্কার হয়। রাহাজানিতে আমি খুব মজবুৎ।

জুলেখা। লাহোরে যাওয়া এখন দূরের কথা ! দিন ত কিছুই স্থির হয় নাই। একটা কাজ করিতে পারেন ত কালই আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হয়।"

আফশান আগ্রহপূর্ণ স্বরে বলিল,—"তোমায় এনাম দ্বিগুণ করিয়া দিব। বল কি করিতে হইবে।"

জুলেখা বলিল,—"কাল মুনিয়া ও হিম্মত, "পীর-পাহাড়ে" যাইবে। পান্নার জন্য তাহাদের সিরনী মানত আছে। কাল সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহারা যাইবে—আর পরশু প্রভাতে তাহারা আসিবে ! এই দিল্‌পসন্দে পান্না একাই থাকিবে।

আফশান মনে মনে কি ভাবিয়া বলিল,—"কিন্তু দ্বারে প্রহরী আছে। মহলে আর আর বাঁদী আছে ! মহলে প্রবেশ করিলে হয়তো গণ্ডগোল হইতে পারে।"

জুলেখা। দ্বারের প্রহরী দুইজন। তাহাদের মোহাড়া আমি লইব। তাহারা আমার সঙ্গে প্রায়ই আস্‌নাই করে। কাল তাদের কৌশলে ভাঙ্গের সরবত খাওয়াইয়া দিব। মহলের মধ্যে মুনিয়া ছাড়া আর তিনজন বাঁদী থাকে। তাহাদের

দুইজন প্রতিদিন রাত্রে মীরাণগড়ে চলিয়া যায়। সুতরাং কাল পান্নার কাছে থাকিব—আমি।

আফশান সেই অন্ধকারে বিকট হাস্য করিয়া বলিল,—"তোমার উপায় কি করিব?"

জুলেখা মৃদুহাস্য করিয়া বলিল,—"মনে কি ভাবিয়াছেন জনাবালি! আমি আপনার টাকা খাইয়া আপনাকে ধরাইয়া দিব! তবে আমাকে বাঁচাইবার জন্য, আপনাকে একটা কাজ করিতে হইবে।

আফশান। কি কাজ?

জুলেখা। আপনি আমার মুখটা ওড়না দিয়া বাঁধিয়া দিবেন। দ্বারের কাছেই আমি আবদ্ধাবস্থায় পড়িয়া থাকিব। তাহা হইলেই আমার সত খুন মাপ!

আফশান বলিল,—"ভাল তাহাই হইবে। তবে একটু কষ্ট করিয়া মহলের পিছন দিকের অই ছোট দ্বারটা খুলিয়া রাখিও।"

এই জুলেখা আফশানের সুপারিসেই পান্নার বাঁদীরূপে একদিন মীরাণশার রঙ্গমহলে নিযুক্ত হইয়াছিল। নানাকারণে সে মুনিয়ার হিংসা করিত। আর পান্না মুনিয়াকে খুব ভালবাসিত বলিয়া, সে পান্নার উপরও মনে মনে বড়ই বিরক্ত।

কথাবার্ত্তা শেষ হইয়া গেলে—জুলেখা বলিল,—"আপনার কাজ অনেকটা আগাইয়া দিলাম। এখন আমায় বিদায়?

আফশান তাহার হস্তে একটি স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ ক্ষুদ্র থলিয়া দিয়া বলিল,—"যদি আমার আশা পূর্ণ হয়—এক মুহূর্ত্তের জন্যও যদি

এই গরবিনী পান্নাকে আমি আলিঙ্গননিপীড়িত করিতে পারি, তাহা হইলে জানিও জুলেখা! তোমার নসীব ফিরাইয়া দিব।"

শয়তান ও শয়তানীতে এই ভাবেই পান্নার সর্ব্বনাশের সকল পরামর্শ ঠিক হইয়া গেল।

জুলেখা অন্ধকার মধ্যে সহসা প্রেতিনীর মত অদৃশ্য হইয়া পড়িল! আফশান দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া বলিল,—"পান্না! কাল ঠিক্ এই সময়ে তোমার সতীত্বের অহঙ্কার চূর্ণ করিব! মনে জানিও, তোমার জন্য এই আফশান তাহার আত্মাকে শয়তানের নিকট বিক্রয় করিয়াছে। তোমায় পাইবার জন্য সে জাহান্নমে যাইতেও প্রস্তুত।"

পাপী যাহারা, পাপকর্ম্মে অগ্রসর যাহারা, বিধাতা প্রায়ই তাহাদের প্রতি বিমুখ হইয়া, তাহাদের অনুষ্ঠিত পাপকর্ম্মের প্রথম সূচনাতেই তাহাদের ধরাইয়া দেন। কিন্তু আফশানের ক্ষেত্রে যেন তাহার বিপরীত ব্যবস্থা হইল।

জুলেখাকে পান্না বা মুনিয়া কখনও সন্দেহের চক্ষে দেখে নাই। দেখিলে তাহার চাকরী থাকিত না। অর্থবলেই এই আফশান, বাঁদী জুলেখাকে হস্তগত করিয়াছিল। আর জুলেখা, গোপনে থাকিয়া পান্না ও মুনিয়ার মধ্যে সকল কথা শুনিয়া, আফশানকে ভিতরের খপর দিতেছিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

হিম্মত ও মুনিয়া, সেইদিন অপরাহ্ন পূর্ব্বে পান্নার মঙ্গল-কামনায় সিরনী দিবার জন্য, পীর-পাহাড়ে চলিয়া গিয়াছে। এই পীর-পাহাড়ে জুম্মাশা বলিয়া এক সিদ্ধ ফকির ছিলেন। তিনি মানুষের অদৃষ্ট কথা বলিতে পারিতেন। শাহজাদাকে সে পতিরূপে লাভ করিবে কি না—তাহা জানিবার জন্য একটা বিশেষ আগ্রহ চালিত হইয়াই, মুনিয়া লাহোর যাত্রার পূর্ব্বে পান্নার অদৃষ্ট পরীক্ষার জন্য, কৌশলে শিরণীর এই বন্দোবস্ত করে!

রাত্রি প্রথম প্রহর বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। পান্না উজ্জ্বলিত কক্ষ মধ্যে মলিনমুখে বসিয়া আছে। মুনিয়ার সঙ্গ হীন হওয়ায় তাহার কিছুই ভাল লাগিতে ছিল না।

পান্না, হাফেজ পড়িতে বড় ভালবাসিত। গ্রন্থখানা তাহার সম্মুখেই খোলা ছিল। সে উন্মুক্তপত্র পুস্তকখানার দিকে দৃষ্টি সংবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার মন ছিল পীর-পাহাড়ে।

সে মনে মনে ভাবিল,—"যদি গনণায় ফল শুভ না হয়! যদি জুম্মাশা ফকির বলিয়া ফেলেন, আমার ও শাহজাদার মিলন অসম্ভব! ইহা বিধিলিপি নয়? তাহা হইলে?"

যদি তাহাই হয়, তাহাতেই বা ভয় কি? নিরাশার যাতনায় ক্রমাগতঃ পুড়িয়া পুড়িয়া এই নারীজাতি শেষে যে উপায়ে চিরশান্তি লাভ করে, আমি তাহাই করিব।

আবার সে ভাবিল,—"না—না, তাহা করিব কেন? যে ভালবাসিতে পারে, ভালবাসিতে জানে, ভালবাসিতে শিখিয়াছে, ইচ্ছাসৃজিত মৃত্যুতে তার কোন সুখই নাই। বরঞ্চ বাচিয়া থাকায় সুখ! যাকে সে ভালবাসে, আজীবন তাহার চিন্তা করাই সুখ। ভালবাসার জন্য—ভালবাসাই সুখ! নিঃস্বার্থ, কলঙ্কশূন্য, স্পৃহাশূন্য, কামনাশূন্য ভালবাসাই যে শ্রেষ্ঠ। ইহা যে সেই বিশ্বনিয়ন্তা বিধাতাকে পাইবার একমাত্র পথ।"

আপনার সুখ দুঃখের চিন্তায় পান্না এতটা বিভোর, যে সে তখনও জানিতে পারে নাই, বাহিরের প্রকৃতি ক্রমশঃ রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি ধারণ করিতেছেন।

সত্য সত্যই আকাশে তখন খুব কালো জলভরা মেঘগুলা, চারিদিকে মত্ত মাতঙ্গের মত ছুটাছুটি করিতেছিল। খুব জোরে হাওয়া বহিতেছিল। বাতাসের সন্‌সনানি ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছিল। ঝড়বৃষ্টি—আসে বলিয়া।

পান্না সচকিত চিত্তে একবার বাতায়ন পথে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল—প্রলয়ের অন্ধকার যেন জলস্থল, বিশ্বব্যোম, ছাইয়া, প্রকৃতির বুকে মৃত্যুর করালছায়া অঙ্কিত করিয়া দিতেছে। আর সেই অন্ধকারের ভীষণতা বৃদ্ধি করিবার জন্য, চঞ্চলা যেন দানবীর মত ভীমভৈরব নৃত্য করিতেছে। অকস্মাৎ মহাশব্দে বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

পান্না দ্বার ভেজাইয়া দিয়া শয্যায় শুইল। তাহার মনটা খুবই খারাপ হইয়া গেল। সহসা তাহার তন্দ্রা আসিল।

তন্দ্রাবশে সে স্বপ্ন দেখিল—তাহার কক্ষের দেয়ালে যেন দুইখানি বড় বড় তৈলচিত্র রহিয়াছে। চিত্রের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সে সবিস্ময়ে বলিল,—"কই এ সব চিত্র তো ওখানে ছিল না—কে রাখিল ?"

একটু স্থিরভাবে প্রথম চিত্রখানি দেখিবার পর, সে স্বপ্নাবেশে মনে মনে বলিল,—"কে—কে শাহজাদা! কি সুন্দর নয়ন-রঞ্জন মূর্ত্তিতে তুমি আমার সম্মুখে আজ উদ্ভাসিত! তোমার নেত্রে দীপ্তি, দৃষ্টিতে করুণা, চাহনিতে প্রেম, ইঙ্গিতে স্নেহ! প্রিয়! আমার আরাধ্য! ইষ্ট! তুমি কি আমার হইবে না ?"

সহসা তাহার দৃষ্টি, পার্শ্বের চিত্রখানির দিকে পড়িল। সে মহা ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। ঘৃণাপূর্ণ স্বরে বলিল,—"শয়তান! আফশানের কলঙ্কিত চিত্র আমার এ কক্ষে কেন ? শাহজাদা! শাহজাদা! তোমার মত দেবতার পার্শ্বে, এই শয়তানের প্রতিষ্ঠা করিল কে ?"

পান্না সেই তন্দ্রাময় স্বপ্নে দেখিল—শাহজাদার ছবিখানা যেন দেখিতে দেখিতে ভিত্তিগাত্রে ছায়ার মত মিশাইয়া গেল। আফশানের মূর্ত্তিখানা যেন—জ্বল্ জ্বল্ নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া বিদ্রুপ করিতে লাগিল। সে দৃষ্টি যেন প্রখর জ্বালাময়! সে ভ্রুকুটি যেন নারকীয় কুটিলতাময়। পান্না ঘৃণাপূর্ণ স্বরে বলিল,—"আঃ—শয়তান আফশান! তুই এখানে কেন ?"

সহসা পান্নার সেই স্বপ্নময় তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সে যে দৃশ্য তাহার সম্মুখে দেখিল, তাহাতে ভয়ে শিহরিয়া উঠিল।

পান্না সবিস্ময়ে দেখিল, তাহার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া সত্য সত্যই সেই মূর্ত্তিমান শয়তান আফশান !

পান্না তখনই শয্যা হইতে উঠিয়া প'ড়য়া বলিল,—"একি ! তুমি কেন এখানে ? কি করিয়া তুমি এখানে আসিলে ? আফ্শান ! ভাল চাও ত এখনিই চলিয়া যাও।"

আফশান কঠোর হাস্যের সহিত বলিল,—"চলিয়া যাইব বলিয়া ত এখানে আসি নাই পান্না ! সাগরের কুলে দাঁড়াইয়া ত তৃষ্ণায় মরিতে পারি না পান্না ! কি নিষ্ঠুর তুমি ? কি পাষাণী তুমি ?

আফশানের জড়িত অস্পষ্ট কথায় পান্না বুঝিল—সে মদ্যপান করিয়াছে। সে বড়ই ভয় পাইল। কিন্তু তখনই মনে মনে বুঝিয়া লইল, ভয়ে তাহার সর্ব্বনাশ—সাহসে উদ্ধার। পান্না সাহসাবলম্বনে বলিল,—"এখান হইতে এখনি চলিয়া যাও। নচেৎ বাঁদীদের ডাকিব ! প্রহরীদের সংবাদ দিব।"

আফশান বিদ্রুপপূর্ণ স্বরে বলিল,—"কতগুলা বাঁদী লইয়া তুমি এই "দিল্‌পশন্দে" ঘর কর পান্না ! তোমার একমাত্র বাঁদী ত আজ জুলেখা,—কাপড়ে তাহার মুখ বাঁধিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। আর তোমার দুইজন পুরীরক্ষক প্রহরী—তাহাদের আগে হত্যা করিয়াছি !"

পান্না ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়া বলিল,—"কেন এ নিষ্ঠুর কাজ করিলে শয়তান ?"

আফশান বলিল,—"আমি শয়তান নই, শয়তানের দাস। সে আমাকে যাহা করিতে বলিয়াছে, আমি তাহাই করিয়াছি।"

পান্না। ছি! ছি! শতধিক্ তোমায়! চোরের মত এ কক্ষে প্রবেশ করিলে কেন?

আফশান। কেন? তোমারই জন্য! তোমাকে এই বক্ষের উপর বিনাবাধায় টানিয়া লইবার জন্য। যে বক্ষ, আজীবন নিরাশায় পুড়িয়া ছাই হইতেছে--সেই বক্ষকে পুনরায় তোমার সরস প্রেমালিঙ্গনে সজীব করিবার জন্য!

পান্না দেখিল—এ শয়তান আটঘাট বাঁধিয়াই তাহার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে। সে মনে ভাবিল—এ বিপদে তাহার সহায় যদি কেউ থাকে ত বিমানান্তরালেস্থিত ঐ মহাশক্তিমান খোদা!

প্রত্যুৎপন্নমতিশালিনী পান্না ভাবিল,—কোন উপায়ে এই শয়তানকে আরও সেরাজি খাওয়াইয়া, মাতাল করিতে হইবে। তাহা না হইলে তাহার রক্ষার আর কোন উপায় নাই।

অপেক্ষাকৃত প্রসন্নভাবে, সুচতুরা পান্না বলিল,—"এতটা নিষ্ঠুর হইও না। বল--কি চাও তুমি আফশান?"

প্রশ্রয়প্রাপ্ত আফশান নিকটস্থ এক সোফায় বসিয়া বলিল,—"চাই তোমাকে! তুমি এখনই আমার সঙ্গে চলিয়া আইস। তোমার পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা স্মরণ কর।"

পান্না। কি প্রতিজ্ঞা?

আফশান। তুমি বলিয়াছিলে, যে আমাকে বিবাহ করিবে।

পান্না। আমি সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে অশক্ত।

আফশান। কেন?

পান্না। তোমাকে সহোদরের মত দেখি। আমায় তুমি

দ্বিচারিণী হইতে বলিও না। এতদিন বলি নাই, আজ বলিতেছি—শাহজাদাকে আমি মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছি।

আফশান। শোন পান্নামতি! আফশানের দেহে জীবন থাকিতে, তাহা কখনই হইতে দিব না। পাঠানের হিংস্র রক্ত আমাদের উভয়ের ধমনীতে প্রবাহিত। যদি শাহজাদাকে তোমায় দিতেই হয়, তাহা হইলে সে তোমার মৃতদেহই পাইবে।

এতগুলা কথা বলিতে যে শক্তিটা ব্যয় হইল, তাহার ফলে আফশান বড়ই তৃষ্ণা অনুভব করিল। সে পান্নাকে বলিল,—"শীতল পানীয় আছে পান্না! একটু দাও। বড়ই তৃষ্ণা বোধ করিতেছি।"

বিধাতাই ইঙ্গিত করিয়া পান্নাকে পথ দেখাইয়া দিলেন; পান্না সহাস্যমুখে বলিল,—"অত তৃষ্ণা লইয়া এ দুনিয়ায় আসিয়াছিলে কেন আফশান? সেরাজি খাইবে কি?"

পান্নার কথার সুরটা যে অতটা নামিয়া পড়িয়াছে, ইহাতে আফশান অনেকটা আশান্বিত ও প্রফুল্লচিত্ত হইয়া বলিল,—"আবার—সেরাজি?"

পান্না সহাস্য মুখে বলিল,—"আবার অবিশ্বাস?"

বৃথা বাক্যব্যয়ে সময় নষ্ট না করিয়া, পান্না সেরাজিপাত্র পূর্ণ করিয়া আফশানের সম্মুখে ধরিল। আফশান তাহা নিঃশেষ করিয়া একটা তৃপ্তিসূচক স্বরে বলিল,—"আঃ"!

তারপর সে পান্নাকে বলিল,—"পান্না! তোমার জন্যই

এ আফশানের অস্তিত্ব। তোমাকে না পাইলে এ আফশান নিশ্চয়ই মরিবে। আর এ কথাও জানিও, যে উপায়ে হৌক, সে তোমায় লাভ করিবার চেষ্টা করিবে। এর জন্য মোগল শাহজাদাকে হত্যা করিতে হয়—”

শিহরিয়া উঠিয়া পান্না আবার সেরাজি ঢালিয়া আফ্‌শানকে দিল। সে আবার খাইল। পান্না ভাবিয়াছিল--আফশান শীঘ্রই অচেতন হইয়া পড়িবে—কিন্তু তাহা হইল না। পান্না তখনই তাহার ভ্রমের ফল বুঝিতে পারিল।

আফশান পানপাত্র শেষ করিয়া সতৃষ্ণ নয়নে একবার পান্নার মুখের দিকে চাহিল। উজ্জ্বল দীপের আলো, সে মুখে পড়িয়াছে। আরক্ত গণ্ডদেশ আরও আরক্ত হইয়াছে। ওষ্ঠাধর ঈষৎ মৃত্-কম্পিত। নাসারন্ধ্র স্ফুরিত। আর চক্ষে বিদ্যুৎশিখাবৎ সমুজ্জ্বল কটাক্ষ! পান্নার এত রূপ!

আফশান উন্মাদের মত চীৎকার করিয়া বলিল,—“এত রূপ! এত রূপ!” সে টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

পান্না যাহা ভাবিয়াছিল, তাহার বিপরীত ফল হইল। মদিরার মোহে নির্জ্জীব হওয়া দূরে থাক, সে আফ্‌শান যেন পূর্ণ সঞ্জীবতা লাভ করিল। শয়তান তাহাকে কাণে কাণে বলিল,—আর কেন? এই তোমার বাসনা সিদ্ধির উপযুক্ত অবসর! পান্না সহজে তোমার হইবে না। শয়তানের শক্তিতে তাহাকে বশীভূত কর।”

আফশান টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল! সবেগে সম্মুখে ছুটিয়া গিয়া, পান্নার ওড়না ধরিতে গেল।

পান্না ব্যাধতাড়িতা হরিণীর মত, দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। আফশান আরও মরিয়া হইয়া পান্নাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিবার জন্য, খুব নিকটে অগ্রসর হইল।

আত্মরক্ষার জন্য, পান্না দ্বারের দিকে সভয়ে ছুটিয়া আসিল। সে দ্বার অর্গলাবদ্ধ। আফশানই সে দ্বার বহুপূর্ব্বে বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

সর্ব্বনাশ হয় দেখিয়া, পান্নাও ভয়ানক মরিয়া হইয়া উঠিল। সে ত্বরিত গতিতে গিয়া, উপাধান নিম্ন হইতে একখানি শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া, কঠোরস্বরে বলিল, -"সাবধান! শয়তান! আর এক পা অগ্রসর হইলেই মরিবি।"

শয়তান আফশান কথা না শুনিয়া, টলিতে টলিতে আবার পান্নাকে আক্রমণ করিতে গেল।

তখন আত্মরক্ষার আর কোন উপায় নাই দেখিয়া, পান্না বিদ্যুৎগতিতে অগ্রসর হইয়া আফশানের বক্ষে সেই তীক্ষ্ণধার ছুরিকা সবলে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল। সে আঘাত—আফশানের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিল। আফশানের বক্ষ নিঃসৃত শোণিত ধারায় তাহার মর্ম্মরমণ্ডিত কক্ষতল লোহিত বর্ণ ধারণ করিল।

ভূপতিত আফশান, গোঁয়াইতে গোঁয়াইতে বলিল, "পান্না শ—য়—তা-নী—করি'লি—কি?—"

পান্না উন্মাদিনীর মত চীৎকার করিয়া বলিল,—"ইহাই তোমার বেয়াদবির শাস্তি। "পান্নার প্রতিশোধ।"

সম্পূর্ণ